ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™ SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা ।। ৩ শ্রাবণ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ২০ জুলাই, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

মুসলিম তোষণের রাজনীতিতেই দাঙ্গা মুর্শিদাবাদে

গূঢ়পুরুষ ।। লোকসভা নির্বাচনে জিততে মুর্শিদাবাদ জেলায় কংগ্রেসের নির্লজ্জ মুসলিম তোষণ নীতির বিষময় ফল এবার ফলতে শুরু করেছে। গত ১০ জুলাই শুক্রবার থেকে টানা তিনদিন বেলডাঙ্গা মহকুমার নওদা থানা এলাকায় ঝাউবোনা ও ত্রিমোহিনীতে ধর্মান্ধ সশস্ত্র মুসলিম গুন্ডা বাহিনী একতরফাভাবে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যে আক্রমণ চালায় তার নজির সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গে নেই। সরকারিভাবে বলা হয়েছে যে দাঙ্গায় মোট চারজন খুন হয়েছেন এবং ১৪ জন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বাস্তবে খুন হয়েছেন কমপক্ষে ১২ জন হিন্দু নাগরিক এবং আহতের সংখ্যা ৫০ জনেরও বেশি। এই প্রতিবেদন লেখার সময় বহু হিন্দু পরিবারের পুরুষেরা নিখোঁজ আছেন। এলাকায় কারফিউ থাকায় পরিবারের অন্যান্যরা নিখোঁজদের হদিশ পেতে অনুসন্ধানও করতে পারছেন না।

দাঙ্গাবিধ্বস্ত ত্রিমোহিনী বাজার।

দাঙ্গা দমনে স্থানীয় থানার পুলিশ বাহিনী নিয়ে ডি এস পি পদ মর্যাদার একজন অফিসার ঘটনাস্থলে পৌঁছলে সশস্ত্র মুসলিম গুন্ডার দল 'আল্লা হু আকবর' ধ্বনি দিতে দিতে পুলিশের উপর গুলি বর্ষণ শুরু করে। গুন্ডাদের হাতে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র থাকায় গুলির লড়াইতে পুলিশ পিছু হটে। ডি এস পি সহ মোট ১২ জন পুলিশ কনস্টেবল গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। শুক্রবার (১০ জুলাই) সারা রাত পুলিশের সঙ্গে দাঙ্গাবাজদের গুলির লড়াই চলে। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে এলাকায় টানা কারফিউ জারি করা হয়। কিন্তু দাঙ্গাবাজরা কারফিউ অমান্য করেই হিন্দুদের দোকানপাট, বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুঠতরাজ চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে মহাকরণ থেকে স্বরাষ্ট্র সচিবের নির্দেশে বি এস এফ, সি আর পি এফ এবং র‍্যাফ বাহিনীর জওয়ানদের দাঙ্গা দমনের জন্য পথে নামানো হয়।

এতসব ঘটনা ঘটে গেলেও কলকাতার সংবাদপত্র বা টি ভি সংবাদ চ্যানেলগুলি সব খবর বেবাক চেপে দেয়। দু-একটি সংবাদপত্রের ভিতরের পাতায় খুবই ছোট করে লেখা খবরে বলা হয় নওদা এলাকায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন। খবর পড়ে কিছুতেই বোঝা যাবে না যে, এই দুই গোষ্ঠী রাজনৈতিক দলের অথবা সমাজবিরোধীদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বখরার লড়াই। অথচ এই সংবাদমাধ্যমই লেখিকা তসলিমাকে তাড়াতে অথবা লালগড়ে মাও ধরতে অক্লান্ত প্রচার চালিয়েছে। গুজরাটে জাতিদাঙ্গায় মুসলিমদের উপর কতটা নির্যাতন হয়েছে তার জন্য দেশের সংবাদমাধ্যম কেঁদে আকুল হয়। গোধরায় রেলের কামরায় আগুন দিয়ে করসেবকদের পুড়িয়ে মারার ঘটনাকে 'কাল্পনিক' বলে উড়িয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। দুর্ভাগ্য, হিন্দু স্বার্থরক্ষাকারী একটিও জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র এবং টিভি সংবাদ চ্যানেল ভারতে নেই। থাকলে সকলেই জানতে পারতেন যে ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ই সবচেয়ে অবহেলিত। দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই ভোটে জিততে মুসলিম তোষণের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। মুসলমানদের জন্য শিক্ষা, চাকরি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই সংরক্ষণ চাইছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় মশাইতো ঘোষণা করে দিয়েছেন যে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলায় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল একটি ক্যাম্পাস গড়ে দেবেন। এর সব খরচ কেন্দ্রীয় সরকার দেবে। প্রণববাবু প্রকাশ্যেই বলেছেন জঙ্গিপুর কেন্দ্রে তিনি মুসলমান ভোটারদের সমর্থন ও দোয়ায় জিতেছেন। তাই সেই ঋণের কিছুটা আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস গড়ে দিয়ে তিনি শোধ করছেন। অথচ দেশের (৭৫-৮০)শতাংশ হিন্দু ভোটদাতাদের জন্য প্রণববাবুদের কোনও দায় দায়িত্ব নেই।

গত ১০ জুলাই নওদা থানার ঝাউবোনা

(এরপর ৪ পাতায়)

দাঙ্গায় কারা?

সংবাদদাতা ।। দাঙ্গায় নেতৃত্বকারীদের কয়েকজন — নিয়াকত মল্লিক (ত্রিমোহিনী), প্রাক্তন কংগ্রেসী অঞ্চল প্রধান আবদুল রসিদ বিশ্বাস, কালু মন্ডল (ত্রিমোহিনী), হেলা শেখ, রাজু মন্ডল (ঝাউবোনা), জিয়ারুল শেখ (ঝাউবোনা), জিয়া শেখ (ঝাউবোনা), আস্তাকিন শেখ (ত্রিমোহিনী), সাহাবুদ্দিন শেখ এরা আক্রমণ হত্যা ও লুটপাটে নেতৃত্ব দিয়েছিল বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যে ১৫ জন মুসলিম দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঝাউবোনা ও ত্রিমোহিনী মিলিয়ে প্রায় দু'শ বাড়ি লুট ও ভাঙ্গচুর করা হয়েছে। চল্লিশটির মতো হিন্দুদের বড় দোকান সম্পূর্ণভাবে লুট করা হয়েছে বলে খবর। দুষ্কৃতীরা রটিয়ে বেড়াচ্ছে বাকী হিন্দুদের শেষ করে দেবে বলে।

মুদ্রাস্ফীতি মাইনাসে কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি আকাশছোঁয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কারা যেন প্রচার করেছিল, দেশে আর্থিক সংস্কারের জনক নাকি মনমোহন সিং! আর এবার তাঁর সরকারের পাল্লায় পড়ে অর্থনীতির পুরো চালচিত্রটাই বদলে যেতে বসেছে। এই মাসে এখনও পর্যন্ত পাওয়া মুদ্রাস্ফীতির হিসেবটা মাইনাস ১.৬১ শতাংশে গিয়ে পৌঁছেছে। দেশের ইতিহাসে বিগত ৩২ বছরের মধ্যে যা প্রথমবারের জন্য ঘটল। অথচ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের দাম প্রতিদিনই হু হু করে বেড়ে চলছে। সরকার দুষছেন বৃষ্টিকে। তাঁদের বক্তব্য, বর্ষার সময়ে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি থেকে যাওয়ায় ঠিকঠাক ফসল উৎপাদন না হওয়াতেই মূল্যবৃদ্ধি - জনিত এই বিপত্তি। খাদ্যশস্য ব্যবসায়ে যুক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা বলছেন, এদেশে এবার খাদ্যশস্যের ফলন ভালো না হওয়ায় বিদেশ থেকে তা চড়া দরে আমদানী করতে হচ্ছে, সেই কারণে এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি।

মুদ্রাস্ফীতির হার

জুলাই, ২০০৮ —	-১১.৪২ %
জুন, ২০০৯ —	-১.১৪ %
৪ই জুলাই, ২০০৯ —	-১.৫৫ %
১০ই জুলাই, ২০০৯ —	-১.৬১ %

মূল্যবৃদ্ধি (প্রতি কেজি বা লিটারের হিসেব টাকায়)

পণ্য	জুন,'০৮	জুন,'০৯	৪ জুলাই '০৯	১০ জুলাই, '০৯
চাল	১৭.৫০	১৭.০০	১৭.৫০	১৭.৫০
চিনি	১৮.০০	২৮.০০	২৮.০০	২৮.০০
অড়হর ডাল	৪৬.০০	৬৩.০০	৬৮.০০	৭৬.০০
মুগ (ধোওয়া)	৪১.০০	৬০.৫০	৫৮.০০	৫৮.০০
মুগ (গোটা)	৩৬.৫০	৫২.৫০	৫৩.৫০	৫৩.৫০
কালো মুসুর	৪৯.৫০	৫৩.০০	৫৩.৫০	৫৭.০০
লবন (আয়োডাইজ)	৯.০০	১১.০০	১১.০০	১১.০০
হলুদ (২০০ গ্রাম)	১৬.৫০	২০.৫০	২০.৫০	২০.৫০
আলু	৮-১০	১০-১২		১৬-২০
পেঁয়াজ	১০-১১	১২-১৪		১৫-২০
লাউ	১০-১২	১৬-১৮		৩০.০০

সূত্র - কেন্দ্রীয় ভান্ডার রেটস অন কমোডিটিস।

একইসঙ্গে তাঁরা দায়ী করছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। তাঁদের অভিযোগ, সরকারের দুর্বল নজরদারির জন্য মজুতদাররা প্রচুর মালপত্র সংরক্ষিত করার সুযোগ পেয়ে গেছে। এমতাবস্থাতেও মুদ্রাস্ফীতির এই ব্যাপক অবনমন দৃশ্যতই বিস্মিত করেছে অর্থনীতিবিদদের। অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে, গত বছরে যেখানে ব্যারল প্রতি ক্রুড অয়েলের (অপরিশোধিত তেলের) মূল্য ১৪০ মার্কিন ডলারের আশপাশে ঘোরাফেরা করছিল, এ বছরে তা কমতে কমতে এসে দাঁড়িয়েছে ৬২ ডলারে। একইভাবে গত বছর জুলাই-এর গোড়াতে মুদ্রাস্ফীতি ছিল ১১.৪২ শতাংশ মতো। আর এ বছরের জুলাইতে সেই মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ মাইনাস ১.৬১ শতাংশ। কিন্তু গত বছর চিনি, অড়হর ডাল, মুগ, কালো ডাল (যা দিয়ে তড়কা প্রস্তুত হয়), নুন, হলুদ, আলু, পেঁয়াজ, লাউ ইত্যাদির যা দাম ছিল, আজ তা অনেকটাই বেড়ে গেছে । অর্থনীতিবিদ্‌রা মনে করছেন, অপরিশোধিত তেলের দাম যখন কমছে, মুদ্রাস্ফীতি যখন কমতে কমতে একেবারে মাইনাসে এবং শেয়ার বাজারের অবস্থাও যখন আগের চাইতে ভালো — এই আর্থিক পরিস্থিতিতে এরূপ ভয়ানক মূল্যবৃদ্ধি সম্ভব নয়, তা সে যতই খরার সম্ভাবনা সৃষ্টি হোক না কেন। তাঁরা আরও মনে করছেন, উত্তর-পূর্ব ভারত ছাড়া দেশের

(এরপর ৪ পাতায়)

তিন রাজ্যে মাওবাদীদের মুক্তাঞ্চল

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গত ১২ জুলাই ছত্তিশগড়ের রাজনন্দগাঁও জেলার এস পি সহ ৩০ জন পুলিশ কর্মীকে হত্যার পিছনে মাওবাদীদের গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম্ উপকূল থেকে ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া জেলা পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে মুক্তাঞ্চল তৈরি করাই এই হত্যাকান্ডের উদ্দেশ্য। এর মাঝে ওড়িশার কোরাপুট ও মালকানগিরি জেলাকেও তারা সংযুক্ত করেছে। তাহলে একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে। এটি মাওবাদীদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন অন্ধ্রের একজন পুলিশ অফিসার। এই পরিকল্পনা কার্যকর হলে বিশাল এলাকা মাওবাদীদের কব্জায় চলে আসবে। সমুদ্র উপকূল থেকে স্থলভাগের অনেক ভিতর পর্যন্ত অবাধে

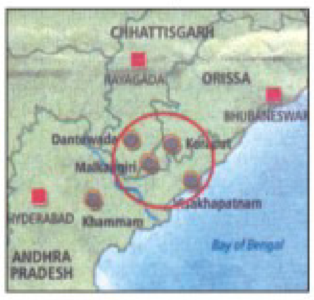

অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে অসুবিধা হবে না মাওবাদীদের। তখন ছত্তিশগড় এবং ঝাড়খণ্ডে পুলিশ অভিযান চললে মাওবাদী নেতা ও ক্যাডাররা অন্ধ্রপ্রদেশ-ওড়িশা সীমান্তে গভীর জঙ্গল এলাকায় ঘোরাফেরা বা লুকিয়ে থাকতে পারবে।

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life INSURANCE
With Us, Your's Sure

মুর্শিদাবাদে আলিগড় মুসলিম বিদ্যালয়ের শাখা

সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে মুসলিমদের অসুবিধা কোথায়?

সত্য মিত্র ।। কেন্দ্রীয় বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও কেরলের মালাপ্পুরম্ জেলায় আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শাখা' খোলার জন্য মোট ৫০ কোটি টাকা প্রাথমিকভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে। যে যুগে প্রায় পাড়ায়-পাড়ায় সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা যায় সে সময়ে কেন বিশেষ করে দুটি বাম শাসিত রাজ্যে সুদূর আলিগড়ের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা খুলতে হচ্ছে তা নিয়ে গুটিকয়েক মানুষ প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুলেছেন। যদিও দেশের সচেতন প্রায় সব মানুষই মনে মনে সঠিক উত্তরটি জানেন। তা হ'ল সংখ্যালঘু তোষণে বামপন্থীদের দিকে 'মাস্টার-স্ট্রোক' ছুঁড়ে দেওয়া।

ভারতবর্ষ খাতায়-কলমে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। অর্থাৎ সহজ কথায় রাষ্ট্র কোনও বিশেষ ধর্মমত বা প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত বা বিরোধিতা করবে না — তা সে সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু যার ধর্মই হোক। শিক্ষা এমন একটি সামাজিক ক্ষেত্র যেখানে মানুষ প্রকৃত মননশীল হতে পারে, পারস্পরিক মেলামেশার মধ্য দিয়ে মূলধারার ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে পারে। যে কোনও দলের প্রভাবিত সরকারের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত জাত-পাত-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে মূল ধারায় আনা। কিন্তু অভিজ্ঞতা অন্যরকম বলে। এমনিতেই জাতপাত ভিত্তিক সংরক্ষণের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে একটা ঠান্ডা লড়াই আছে। এর থেকেও বাড়াবাড়ি রকম হয়ে উঠছে তথাকথিত উন্নয়নের নামে সংখ্যালঘুদের, স্পষ্ট করে বললে মুসলমানদের মূল ধারা থেকে ক্রমশ আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে।

যারা আদর্শগতভাবে মানুষের কোনও ধর্মীয় পরিচয় মানেন না সেই বামপন্থীরাও হঠাৎ অনুভব করেছেন সাধারণ বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় নয় — মাদ্রাসা ও বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয় না খুললে বোধহয় সংখ্যালঘুদের শিক্ষা এগোবে না। তাই তারাও সাম্প্রতিক অতীতে লাগামছাড়াভাবে মাদ্রাসার অনুমোদন দিয়েছেন। পরিকাঠামো, পড়াশোনার মান, শিক্ষক-শিক্ষিকার যোগ্যতা উপেক্ষিত থেকে গিয়েছে। অলিতে-গলিতে অনুমোদনের আশায় ঝুলে পড়েছে মাদ্রাসার সাইনবোর্ড। যদিও পশ্চিমবঙ্গ, কেরলসহ সারা দেশে সাধারণ বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। সেখানে পড়তে গিয়ে শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিচয়ে সেইসব ছেলে-মেয়েরা একটা বৈষম্যের শিকার হয়েছে তেমন খবর খুব একটা পাওয়া যায়নি। তবুও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মনে হচ্ছে সংখ্যালঘুদের শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্ভব নয়। আর যাদের জন্য এত কথা সেই মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকরা ঠিক কী চাইছেন তা শোনার কেউ নেই।

যে সব সরকার, যে সব রাজনৈতিক দল মনে করছেন সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকতেই হবে তারা কী কোনও জনমত সমীক্ষা করেছেন? জানতে চেয়েছেন সাধারণ মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকরা মাদ্রাসা বা 'মুসলিম' শব্দযুক্ত মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে কতটা আগ্রহী? মুসলিম সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীদের কোনও মতামত নেওয়া হয়েছে? ব্যক্তিগতভাবে এই নিবন্ধকার একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি সমাজের প্রতিষ্ঠিত, আলোকপ্রাপ্ত, শিক্ষিত অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের মাদ্রাসায় ভর্তি করেন না। ছেলেমেয়েকে পাঠান সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। একশ্রেণীর মুসলিম অভিভাবক যারা নিজেরা ততটা শিক্ষিত নন কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য করে বিত্তশালী হয়েছেন তারাও ছেলেমেয়েদের পাঠাচ্ছেন বেসরকারি ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে। খৃস্টান মিশনারীদের স্কুল, কলেজ কিংবা সরস্বতী শিশু মন্দিরগুলিতেও বড় সংখ্যার মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী স্বচ্ছন্দে পড়াশোনা করছে। এমনকী মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেশিরভাগই তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠান সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষিত, যুক্তিবাদী, বাস্তববাদী মুসলিম অভিভাবকরা চান না যে তাদের ছেলে-মেয়েরা মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত থাকুক।

এক সময় এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা টোল-চতুষ্পাঠী কেন্দ্রিক ছিল। এখন সে সব অতীত। বৃহত্তর হিন্দু সমাজও চায় না সরকার আবার নতুন করে টোল খুলুক বা দেশের বিভিন্ন স্থানে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা খোলা হোক্। শুধুমাত্র টোল-চতুষ্পাঠীর গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকলে হিন্দু ছেলে-মেয়েদের অগ্রগতি ঘটতো না। বেদ-ব্যাকরণ সংস্কৃত সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ — এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেগুলি এখনও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। তা বলে আধুনিক বিষয়শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস্তবজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়।

আলোকপ্রাপ্ত, প্রগতিশীল মুসলিমরা দাবি তুলুন — আর মাদ্রাসা মক্তব নয়, মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত এলাকায় সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যালয় বেশি সংখ্যায় খোলা হোক। সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনাদের ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করুক যাতে ভবিষ্যতে তাদের কোনও হীনমন্যতায় না পড়তে হয়। প্রতিযোগিতা থেকে দূরে নয়, মুসলিম ছেলেমেয়েরা সামর্থ্য অর্জন করে প্রতিযোগিতায় সফল হোক, মাথা উঁচু করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক।

বিভিন্ন সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মুসলিমদের কৌশলে মূল ধারার আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে দূরে ঠেলে দিয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিচয়ে, নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আটকে রাখতে চাইছে, ধর্মীয়প্রভেদকে স্থায়ী করতে চাইছে। এই কৌশলের বিরুদ্ধে অন্যদের থেকে অনেক বেশি সোচ্চার হতে হবে মুসলিমদের। মুসলিম অভিভাবকরা বলুন — 'শুধু মোল্লা মৌলভী নয়, আমাদের ছেলে-মেয়েরা ভালো শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে পড়বে তা তিনি যে ধর্মেরই হোকনা কেন, বিশেষ পাঠক্রম নয়, অন্যদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাধারণ পাঠক্রমেই তারা শিখবে।'

এক নিম্নবিত্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান যদি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষায় এ পি জে আব্দুল কালাম হতে পারেন — অন্যদের অসুবিধা কোথায়!

এই সময়

মদতে এনজিও

ঝাড়খন্ডে মাওবাদীদের মদত যোগাচ্ছে কিছু এনজিও। প্রায় পঞ্চাশটার মতো এনজিও তাদের সব রকম সাহায্য করছে। এমনই চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশ করেছে ঝাড়খন্ড পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ। স্পেশাল ব্রাঞ্চের মতে ওইসব এনজিও মাওবাদীদের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করছে। ইতিমধ্যেই এর প্রতিরোধে মাওবাদী উপদ্রুত অঞ্চলের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। সেই সঙ্গে একাজে যুক্ত এনজিওগুলির চিহ্নিতকরণের কাজও শুরু করেছে স্পেশাল ব্রাঞ্চ। এ কাজে সাধারণ মানুষের যোগসাজস থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

প্রমীলা বাহিনী

প্রায় এক হাজার মহিলা বাহিনী নামাতে চলেছে বি এস এফ। পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারাও মাঠে নামছে। এই মাসের শুরুতেই তাদেরকে খাটকা ও পাঞ্জাবে নামানো হবে। বি এস এফের পক্ষ থেকে মহিলা বাহিনীকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। বর্ডার ম্যানেজমেন্টসহ অস্ত্র চালানো প্রভৃতি বিষয়ে প্রমীলা বাহিনীকে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে। বিএসএফের পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপ প্রথম। উল্লেখ্য, এমন প্রমীলা বাহিনী সি আর পি এফ, সি আই এস এফ, এস এস বি-তে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে।

মাওবাদী প্রকোপ

দেশজুড়ে মাওবাদীদের প্রভাব দিনকে দিন আরও বাড়ছে। ভারতের ১৪ রাজ্যে আড়াইশোর-ও বেশি জেলা মাওবাদীদের হিংসাত্মক ঘটনার শিকার হয়েছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে মে, মাত্র একমাসের মধ্যেই একশোরও বেশি নিরাপত্তা কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সমগ্র দেশে প্রায় ৫০ হাজারের কাছাকাছি মাওবাদী রয়েছে। যার মধ্যে ২০ হাজার মাওবাদী অস্ত্র চালানোয় প্রশিক্ষিত। দেশের ১৫০-এরও বেশি জঙ্গলে তাদের প্রভাব সর্বাধিক।

চীনা বিপদ

চীন থেকে সাবধান হতে বললেন বিশেষজ্ঞরা। ২০১২ সালের মধ্যে চীন ভারতের ওপর বড় আক্রমণ চালাতে পারে। এমনই আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন ভারতীয় নিরাপত্তা বিভাগের পত্রিকা 'ইন্ডিয়ান ডিফেন্স রিভিউ'-এর সম্পাদক ভরত বর্মা। ভরত বর্মার মতে চীন সেদেশের মন্দা, জন-অসন্তোষের ঘটনা থেকে জনগণের মুখ ঘুরাতে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগসাজসে ভারত আক্রমণ করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত মাসে যখন অরুণাচলে 'সুখোই' যুদ্ধ বিমান নামানো হয়, তখন চীন এবিষয়ে আপত্তি জানায়। ইউপিএ সরকার পুরনো ঐতিহ্য মেনে বিষয়টি ইউ এন এ-তে তোলে।

দুর্নীতি

দুর্নীতিও পিছু ছাড়ছে না বিশ্বজোড়া আর্থিক মন্দার। আর্থিক মন্দার হাত থেকে রেহাই পেতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলি ৫০ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের যে 'স্টিমুলাস ফান্ড' গড়ে তুলেছে, তাও দুর্নীতির হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। মন্দাক্রান্ত দেশগুলি আপৎকালীন অবস্থায় এই ফান্ড থেকে টাকা ধার নিতে পারে। কিন্তু আমেরিকার এক পরামর্শদাতা সংস্থা — 'ক্রল'-এর মতে এই টাকাও দুর্নীতির শিকার হতে পারে। 'ক্রল' এর আশঙ্কা, ওই টাকায় যে কাজ হবে, তা দুর্নীতিমুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

ধূমপায়ী

ধূমপায়ী মায়েদের ক্ষেত্রে দুঃসংবাদ শোনাল বিশেষজ্ঞরা। কানাডা ও নেদারল্যান্ডের একটি যুগ্ম গবেষণায় প্রকাশ, যে সব গর্ভবতী মেয়েরা ধূমপান করেন, ভবিষ্যতে তাদের সন্তানের উপর তার মারাত্মক প্রভাব পড়বে। ধূমপায়ী মহিলাদের সন্তানেরা উগ্র প্রকৃতির হয়ে থাকে। গবেষণায় জানা গেছে, এইসব সন্তানেরা সহজেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পরিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারে না। বিশেষজ্ঞদের মতে ধূমপানের কুফলের প্রভাবেই এটা হয়।

হিন্দুত্ব

হিন্দুত্বের ওপর আবারও গর্ব প্রকাশ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি রাজনাথ সিং। দলও হিন্দুত্বের পথেই চলতে চায়। রাজনাথ দিল্লীতে এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সামনে এই বার্তাই তুলে ধরেন। গত ১২ জুলাই ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার কার্যকারিণীর বৈঠকে এক বিবৃতিতে তিনি একথা বলেন। শ্রীসিং বলেন, শক্তিশালী দেশ তৈরির জন্য সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদের বিচারধারার প্রয়োজন। সেই সঙ্গে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ভাবনাতেও বিশ্বাস রাখা দরকার।

অসম্পূর্ণ কল

আপনি কাওকে মিসড কল করুন আর না করুন, ভারতবাসী হিসাবে আপনি একাজে এক নম্বরে। ভারতসহ এশিয়ার ৬টি দেশে সমীক্ষা চালিয়ে জানা গেছে ভারতীয়রাই সব থেকে বেশি অসম্পূর্ণ কল করে। সমীক্ষাতে আরও প্রকাশ ৩৫ বছর বয়সী মোবাইল ব্যবহারকারীদের নাকি বেশি পছন্দ এস এম এস। বিবাহিত মহিলাদের কাছে প্রিয় লান্ডলাইনে কথা বলা।

ডায়নাসোর!

ডায়নাসোরের ডিমের সংগ্রহশালা! শুনতে আবোল-তাবোল শুনালেও, এমনই হতে চলেছে মধ্যপ্রদেশে। মধ্যপ্রদেশের মান্ডু জেলায় ইতিমধ্যেই এমন সংগ্রহশালা তৈরিও হয়ে গেছে। 'হথনী এগ মিউজিয়াম' নামে এই সংগ্রহশালায় পর্যটকদেরও ভিড় নজরে এসেছে। হথনী নদীতে ডায়নাসোরের ডিম পাওয়া যায়। পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, একশরও বেশি ডিম উদ্ধার করা গেছে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সমকামিতা — সমাজ, সংস্কৃতি ও সংবিধান

দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের কার্যকাল শুরুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সমকামিতাকে বৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে দিল্লী হাইকোর্ট। এতদিন আমাদের সংবিধানের ৩৭৭ ধারায় উভয় নারী কিংবা উভয় পুরুষের মধ্যে যৌনানুভূতিমূলক ক্রিয়াকলাপ ছিল একটি অন্যতম সাংবিধানিক অপরাধ। কারণ এটি প্রকৃতিবিরোধী। সৃষ্টির আরম্ভ কাল হইতে যে কোনও প্রাণীর বংশবৃদ্ধির জন্য নারী-পুরুষের মিলনকেই কারণ হিসাবে স্বীকার করা হইয়াছে। এই প্রবৃত্তিকেই সংস্কৃতি করিয়া মানব সমাজ বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছে। এই সূত্রেই পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে। এখন যাহারা সংবিধানের ৩৭৭ নং ধারা বাতিলের দাবী তুলিয়াছেন, তাহারা প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর বিষয়টি বোধ হয় খেয়াল করেন নাই। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের যাহা পরিণাম, তাহাই তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

আমাদের দেশের মানুষ যে কাম-কলা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন এমন নহে। সাহিত্যে ভাস্কর্যে স্থাপত্যে তাহার ভুরিভুরি প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু কোথায় মর্যাদার সীমারেখা টানিতে হইবে তাহারা তাহা জানিতেন। এই মর্যাদার রেখা অতিক্রম করিলে সমাজে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে, তাহাও অবিদিত নয়।

দিল্লী উচ্চ আদালতের রায়ে একপ্রকার বিকৃত সুখানুভূতি প্রবণ মানুষ খুবই উল্লসিত হইয়াছে নিঃসন্দেহে। তাহারা তাহা গোপনও করেন নাই। সমাজ যেন বড়ই করুণরূপে বে-আব্রু হইয়া পড়িয়াছে। কিছু কিছু নির্লজ্জ জুড়ি ইতিমধ্যেই আইনি স্বীকৃতি লাভের পথে নামিয়াও পড়িয়াছে। তাহারা আইনসঙ্গত দম্পতি হইতে চায়। কিন্তু সমাজ তাহাদের কিভাবে গ্রহণ করিবে তাহার দিশা আদালতও দিতে পারে নাই। দম্পতি হইতে গেলে তো আগে পতি ও পত্নী হইতে হয়। কিন্তু উভয়েই যদি পতি হয়, কিংবা উভয়েই যদি পত্নী হয় তাহা হইলে কে স্বামী কে-ই বা স্ত্রী হইবে? সমাজে তাহাদের অবস্থান কি হইবে?

স্মরণ করা যাইতে পারে দিল্লী উচ্চ আদালত কিন্তু ৩৭৭ ধারা খারিজ করিয়া দেয় নাই, দেওয়ার ক্ষমতাও বোধ হয় নাই। কারণ আইন সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন কিংবা নতুন কানুন পাশ সংসদেই হইয়া থাকে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের ভোটের সংখ্যাধিক্যে। আদালতের আইন পাশের বা রদের ব্যাপারে কিছুই করিবার নাই। আদালত কেবল কোন কাজটি আইনসঙ্গত বা কোন আইনটি সংবিধান লঙ্ঘন করিতেছে তাহাই দেখিয়া থাকে।

সুতরাং দিল্লী উচ্চ আদালত তাহার এক্তিয়ার লঙ্ঘন করে নাই। সমকামিতার ফৌজদারী বিধান ৩৭৭ ধারাকে আদালত খারিজ করে নাই। শুধুমাত্র তাহাদের রায়ে বলিয়াছে যে সমকামীদের বিরুদ্ধে ৩৭৭ ধারা প্রয়োগ সংবিধানের ২১, ১৪ ও ১৫ নম্বর ধারাকে লঙ্ঘন করিবার সামিল। আদালতের রায়ে প্রাপ্ত বয়স্কদের যৌন সুখানুভূতিমূলক গোপন ক্রিয়াকলাপ এবং জোরপূর্বক ধর্ষণের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পরিপূর্ণ পার্থক্য রেখা টানিয়া দিয়াছে। ইহাতেই অতি উৎসাহীর দল ধরিয়া লইয়াছে যে তাহাদের অবৈধ ক্রিয়াকলাপের আগল আদালত খুলিয়া দিয়াছে।

ভারতীয় সমাজ একটি চিরন্তন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। অন্য সমাজ ও সংস্কৃতির দৈত্যরা আসিয়া শতশত বছর ধরিয়া সহস্র সহস্র আঘাত হানিয়াও এই প্রবহমান সমাজ সংস্কৃতিকে চূর্ণ করিতে পারে নাই। রাজনৈতিক পরিবর্তন বারবার হইয়াছে বটে কিন্তু সামাজিক পরিবর্তন নৈব নৈব চ। "শক-হুন-দল-মোগল-পাঠান" ও পরবর্তীকালে ইংরেজরা এদেশে শাসক হইয়া বসিয়াছিল বটে কিন্তু শক-হুন-দল-মোগল-পাঠান, কবির মতে, "এক দেহে হল লীন"। সামাজিক পরিবর্তন বৈদিক সংস্কৃতি, সনাতন ধর্মের পরিবর্তন বিন্দু মাত্রও হয় নাই। হিন্দুস্থান, হিন্দুস্থানই রহিয়া গিয়াছে আজও।

স্বামীজীও তাই বলিয়াছেন "ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন, এদেশে চিরকাল।" এইসব পরানুকরণকারী, ইংরেজনবীশ দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন — "যদি না পসন্দ হয় সরে পড় না কেন? তোমাদের দু-চারজনের জন্য দেশশুদ্ধ লোককে হাড় জ্বালাতন হবে বুঝি?" এই সনাতন সমাজ ও সংস্কৃতির ধারা যে কত সুদৃঢ় তাহার প্রমাণ আমাদের বেদ, উপনিষদ, বা শংকরাচার্য, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ, ডাঃ হেডগেওয়ার কিংবা শ্রীগুরুজীর (এম এস গোলওয়ালকর) বহু আখ্যানে বিধৃত আছে।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ প্রয়াত বিদগ্ধ শাশ্বতঐতিহাসিকগণ একথা পরিষ্কারভাবে বলিয়াছিলেন যে বিদেশী শাসকগণ এদেশের মানুষের কাছে প্রতিহত হননি, হয়েছেন এদেশের অচলায়তন সমাজের কাছে। বাইরে থেকে আক্রমণ করিয়া এতকাল ধরিয়া এই সমাজকে ভাঙ্গা যায়নি। তাই ইংরেজ আমল হইতেই ইংরেজরা মেকলেদের এই কাজে নামাইয়াছিল। ইহাদের কাজ ভিতর হইতে এই সমাজকে একটু একটু করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলা। ইহা হইল ট্রয়ের যুদ্ধের কৌশল। ভিতর হইতে আক্রমণের কৌশল। কংগ্রেস ইংরেজের এই কৌশলের বরাবরের অংশীদার ছিল। সনিয়ার আমলে তো ইহা বারবার দেখা যাইতেছে রাজনৈতিক সুযোগমতো কংগ্রেসের অনুকূলের মামলাগুলি আদালতে উঠিয়াছে। সি বি আইও সেই মামলাগুলিই তুলিয়াছে যেগুলি নির্বাচনে কংগ্রেসের কাজে লাগে। আজ তাই সন্দেহ হয় এই রায়ও ইংরেজদের চালু করা সেই কৌশলের অংশ কিনা!

টেলিভিশনেই পরাস্ত

ভাস্কর ঘোষ

বহু বছর ধরে আমি একটা কথা বলে আসছি যে, রাজনৈতিক সুবিধের জন্য নিজের স্বার্থে টেলিভিশনকে ব্যবহার কখনই শাসক দলকে নির্বাচনে জেতাতে সাহায্য করে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নির্বাচনী ফলাফল আমার এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছে। আপন স্বার্থে টেলিভিশনকে ব্যবহার করার এই বিতর্ক একদা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল যখন দূরদর্শন ছিল ভারতবর্ষের একমাত্র চ্যানেল এবং এমনকী যখন এটা কোনও পক্ষের হয়েই কাজ করত না।

তবে আমার উপরিউক্ত যুক্তিকে একপ্রকার নস্যাৎ করেই, '৮৭-র আমেদাবাদ লোকসভার উপনির্বাচনে শাসক পার্টিকে যথেষ্ট তোষামোদ করেছিল রাষ্ট্রের টেলিভিশন নেটওয়ার্ক। সেই সময় বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং কংগ্রেস ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং জনতা দলের প্রার্থী হিসেবে কংগ্রেসের অনিল শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কিন্তু দূরদর্শনের সেই কংগ্রেসী পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচনী প্রচার ভোটে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। ভি পি সিং শেষ প্রচেষ্টা মাত্র। এটা আরও ভালো বোঝা গেছে ১৯৯৬ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময়। তখন ব্যক্তিগত টেলিভিশন চ্যানেলগুলো ক্রমশ আসর জমাতে শুরু করেছে এবং দূরদর্শনের একচেটিয়া সংবাদ প্রচারের ক্ষমতাটা ক্রমশ অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু চিরাচরিত গল্পটি সেদিন অপরিবর্তনীয়ই ছিল। দূরদর্শনে দেখানোর জন্য একটি বিশেষ নির্বাচনী প্রচার তৈরি করা হয়েছিল শাসক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। যার কোনও প্রভাব কিন্তু সেদিন পড়েনি। যার দরুণ শাসক কংগ্রেসের নির্বাচনী পরাজয় ঘটেছিল।

অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে ১৯৯৯ সাল নাগাদ যে সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছিল তারাও কি এই উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, দূরদর্শনকে আপন স্বার্থে ব্যবহার আদৌ কোনও ফলদায়ক হবে না।

২০০৪ সাল নাগাদ সাধারণ নির্বাচনের সময় তারা (বাজপেয়ী সরকার) কি বেহালার ছড়ির (বেহালা বলতে লেখক এখানে নিজের স্বার্থে ইলেকট্রনিক সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহার করার কথা বুঝিয়েছেন) রাশ টেনে ধরতে পেরেছিলেন? মোটেই তা পারেননি। পূর্ববর্তী যাবতীয় সরকারের পথই অনুসরণ করেছিলেন তাঁরা। যার ফল হয়েছিল একই।

তবে শেষ নির্বাচনে, দূরদর্শনে বেহালার সুর-মূর্ছনাটা খুব একটা পরিষ্কার নয়। এটা খুবই আশ্চর্যজনক হোত, যদি নির্বাচন কমিশনের আদর্শ আচরণবিধি থাকা সত্ত্বেও দূরদর্শন পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলোর মতোই সরকারপক্ষের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট নিজের আচরণকেই অক্ষুণ্ণ রাখত। পুরো বিষয়টিকে গ্রহণ করে এই সময় কেউ একজন উঠে দাঁড়াতেই পারেন এবং বলতে পারেন, যে পরিকল্পনা মাফিকই কাজ হয়েছে। কিন্তু নিয়মেরও ব্যতিক্রম থাকে। ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স ছহুত্নট্টগ্ন সরকারের নির্দেশে কিন্তু সবসময় এবার নিজস্বার্থ রক্ষাবাহী অনুষ্ঠান হতে পারেনি। এর কৃতিত্ব অবশ্যই পাচ্ছেন নির্বাচন কমিশন। তাঁদের পর্যবেক্ষণের গভীর দৃষ্টিই প্রকাশ্যে অন্ততঃপক্ষে চ্যানেলগুলিকে 'আদর্শ আচরণবিধি' ভাঙ্গতে দেয়নি। নির্বাচনে এক্সিট পোল সংক্রান্ত বিষয়গুলির সম্প্রচার নিষিদ্ধ করা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত এবার বেশ কাজে এসেছিল। কমিশনের এহেন সিদ্ধান্ত ও সেই সাথে পাঁচ দফায় নির্বাচন করার পরিকল্পনার ফলে একটা জিনিস স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যে টেলিভিশন চ্যানেলগুলির ভোটারদের প্রভাবিত করবার ক্ষমতা প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়েছে। নিকষ কালো চুক্তির সেই অন্ধকারময় দিকটা বিগত নির্বাচনগুলির মতো এবারও অব্যাহত ছিল এবং তির্যক, ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকা "বৈশিষ্ট্যগুলি" বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে সম্প্রসারিত হয়েছে কিন্তু সেগুলো নিছক গল্পই থেকে গিয়েছিল, সম্ভাব্যতার নিশ্চিন্ত আভাসটুকুও পায়নি।

সব কিছু বাদ দিলেও এই সত্যটা আমাদের মেনে নিতেই হবে যে, টেলিভিশন যোগাযোগের একটি বড় শক্তি হয়ে উঠবে অচিরেই যদি তাদের অনুষ্ঠানগুলি কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের কোলে ঝোল টেনে না হয়। এ বিষয়ে আমার একটা খুব খারাপ অভিজ্ঞতা হল, কোনও বিষয় যেটা নীতি নির্ধারক স্তরে তাদের (রাজনৈতিক দলগুলি) সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায়, কোনও প্রভাবে প্রভাবিত না হয়েই, এক শ্রেণীর দর্শকরা তা দেখেন নিজ স্বার্থবাহী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই। একজন রাজনীতিকের ক্ষমার অযোগ্য ভুল হল, তাঁরা মনে করেন যে, ভোটারকে সহজেই প্রতারিত করা যায়। কিন্তু ভোটাররা মোটেই সেরকম নন। তাঁরা পুরো জিনিসটাকে খুঁটিয়ে দেখেন এবং 'নিজ স্বার্থবাহী' অনুষ্ঠান চলার সময় এর মধ্যে প্রমোদমূলক অংশ কতখানি তা সন্দেহের চোখে পর্যবেক্ষণ করেন। এবং ভোট দেন তাঁকেই যাঁর ওপর তারা সন্তুষ্ট হন, সাধারণত যারা নিজের কোলে ঝোল টেনে অনুষ্ঠান করে, তার বিপক্ষেই ভোট দেন ভোটাররা।

দুটো উদাহরণ এর জন্য যথাযোগ্য হতে পারে। নরসিমা রাওয়ের মন্ত্রীসভার শেষদিকে তাঁর ম্যানেজারেরা কয়েকটি ছোট দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন, যেগুলিতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল যে নরসিমা রাও একজন ভদ্র, সন্তানের প্রতি স্নেহশীল এক পিতা, যিনি বহু জনকল্যাণ মূলক কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। কিন্তু এই পরিকল্পনাটা সেদিন কাজে আসেনি। আবার ন্যাশানাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এন ডি এ) আমলের শেষ দিকে, ভারত উদয়ের বলিষ্ঠ প্রচার দেখা গিয়েছিল দূরদর্শনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। যদিও এই প্রচার নির্বাচন কমিশনের প্রদত্ত সীমারেখাকে কখনই লঙ্ঘিত করেনি। কিন্তু এই ধরনের প্রচারেও কোনও কাজ দেয়নি সেদিন।

কিন্তু ২০০৯-এ যে ব্যতিক্রমটা ঘটল, তাতে বেশ কয়েকটা 'ফ্যাক্টর' কাজ করেছে ইউ পি এ-কে পুনরায় ক্ষমতায় আনার ব্যাপারে এবং এর জন্য শুধু টেলিভিশনকেই দায়ী করলে চলবে না। ব্যঙ্গাত্মকভাবে বলতে গেলে একটা কথা বলতেই হয়, টেলিভিশন যে উপরিউক্ত পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ফ্যাক্টর' রূপে প্রতিভাত হয়েছিল তা নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীরা বা রাজনৈতিক দলগুলির স্ট্রাটেজী নির্মাণকারীরা কেউই উপলব্ধি

(এরপর ১৩ পাতায়)

"টেলিভিশনের ইমপ্রেশন (প্রভাব) এইসব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের পার্থক্য গড়ে দেয়। আজকের দিনে টেলিভিশন দেশের কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। আপন স্বার্থে ব্যবহার করা ছাড়া নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীরা কেউই কোনও মাধ্যমের (মিডিয়াম) ক্ষমতাকে আর কাজে লাগাতে পারবেন না যেটা তাঁরা বরাবরই পেরেছেন।"

পর্যন্ত নির্বাচনে জয়ীই হয়েছিলেন।

এর পরবর্তী পর্যায়ে তামিলনাড়ু বিধানসভার নির্বাচনে ওই একই দলের (কংগ্রেসের) তরফ থেকে, একই দল বলাটা অবশ্য ঠিক নয়, বিশেষ ওই দলেরই প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রতিপক্ষদের (বিশেষত যাঁরা মনে করতেন যে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীত্বের চেয়ারের খুব কাছাকাছি আছেন) উচিত শিক্ষা দেবার জন্য দূরদর্শনকে একই কৌশলে কাজে লাগিয়েছিলেন।

ফল হয়েছিল, কংগ্রেসের বিপুল ব্যবধানে ভোটে পরাজয়। ১৯৮৯-তেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল। ওই বছরও শাসক কংগ্রেসকে তোষামোদ করে যে বিশেষ অনুষ্ঠানসূচী প্রদর্শনের ছব্ধন্দ্বপুন্দ্বন্তন্ত্বদব্ধগ্ন-এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা এক কথায় মাঠে মারা গিয়েছিল। এর পরবর্তী পর্যায়ে যে কয়েকটি স্বল্প মেয়াদী সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল তারাও ওই একই ধরনের কার্যকলাপ চালিয়েছিল এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছিল।

১৯৯১-তে, রাজীব গান্ধীর দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু (শ্রীলঙ্কার জঙ্গিগোষ্ঠী এল টি টি ই-র আত্মঘাতী হামলায় তামিলনাড়ুর শ্রীপেরামপুদুরে মারা যান রাজীব)-র পরে যে প্রবল সহানুভূতির হাওয়া উঠেছিল দেশজুড়ে, সেই হাওয়াতেই সওয়ারী হয়ে ক্ষমতার অলিন্দে প্রত্যাবর্তন করেছিল কংগ্রেস। একটা কথা মনে হচ্ছে, যাঁরা ক্ষমতার পরিচালনগোষ্ঠী — স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আমাত্যগণের একটা জিনিস অবশ্যই বোঝা উচিত যে টেলিভিশনকে নির্বাচনে আপন স্বার্থে ব্যবহার একটি ব্যর্থ

মিডিয়া শাসন এবার হাত নেট-এর গলায়

ইন্দ্রমোহন উপাধ্যায়

দেখে-শুনে

নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আপতকালীন অবস্থায় টেলিভিশন চ্যানেলে ‘অনুমোদিত’ ছবি ও খবরই কেবল সম্প্রচার করা যাবে — মাস ছয়েক আগে এমন একটা বিজ্ঞপ্তি জারি করতে গিয়ে পিছু হটতে হয়েছিল মনমোহন সিং সরকারকে। চ্যানেল মালিকরা সেদিন দেখানোর আগে ‘ভিডিও ফুটেজ’ জমা দেওয়ার সরকারি ফরমান মানতে চাননি। ফলে এখন বাড়তি শক্তি নিয়ে ক্ষমতায় ফিরে সোনিয়া নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার শুধু সংবাদ চ্যানেল নয়, এমনকী ওয়েবসাইটগুলিকেও বাগে রাখতে উদ্যোগী হয়েছে। ২২ মে ‘টাইমস অব ইন্ডিয়া’ খবর দিয়েছে, আমাদের তথ্য প্রযুক্তি আইনের কিছু সংশোধন গত ডিসেম্বরে সংসদে পাশ হয়। ফেব্রুয়ারি মাসে তাতে রাষ্ট্রপতির সায়ও মিলেছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় রুলস বা বিধি তৈরি না করলে ওই আইন কার্যকর করা যাবে না। তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক সেই রুলেরই একটা খসড়া সম্প্রতি প্রকাশ করেছে। আর তাতেই ওয়েবসাইটের বিষয়বস্তুর উপর পুরোদস্তুর নিয়ন্ত্রণ আনতে ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিধি অনুযায়ী ক্ষমতা থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের একজন ভারপ্রাপ্ত অফিসারের হাতে। নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে তিনি যে কোনও সময় ‘নেট’-এর যে কোনও তথ্য সাধারণের কাছে পৌঁছানোর পথ বন্ধ করে দিতে পারবেন। ওয়েবসাইটটির মালিক বা ‘হোস্ট’-কে আগে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ না দিয়েই। ব্যবস্থাটা রাখা হয়েছে এইরকম : ‘নেট’-এর তথ্য সম্পর্কে কোনও অভিযোগ উঠলে ওই ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নেতৃত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রক কমিটি তা খতিয়ে দেখবে। অভিযোগ ঠিক বলে মনে হলে হোস্টকে ওয়েবসাইটের তথাকথিত আপত্তিকর তথ্য ‘ব্লক’ করে দিতে নির্দেশ দেওয়া হবে। নির্দেশ না মানলে হোস্টের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হবে। যার সাজা সাত বছর পর্যন্ত জেল। প্রতিকার পাওয়ার রাস্তা একটাই। দু’মাস অন্তর রিভিউ কমিটি বসবে। তারা চাইলে ওই ব্লকিং বহাল রাখতে বা তুলে দিতে পারবে। তবে ক্ষতিগ্রস্ত ওয়েবসাইট কোনও আপিল করতে পারবে কিনা তার কোনও উল্লেখ খসড়ায় নেই।

দেখা যাচ্ছে, মিডিয়া শাসনের পুরো ব্যাপারটাই তুলে দেওয়া হয়েছে আমলাতন্ত্রের হাতে। অথচ কোনও কিছুকে ‘রাষ্ট্রবিরোধী’ ও ‘জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে হানিকর’ বলে তকমা লাগিয়ে দিতে আমাদের আমলারা যে কত তৎপর ও সিদ্ধ হস্ত, অতীত অভিজ্ঞতায় তা কারোরই অজানা নয়। তাছাড়া অভিযুক্ত পক্ষের বক্তব্য না শুনে আমলাদের অভিমতকেই বা কেন বেদবাক্য মনে হবে? ওয়েবসাইটের হোস্ট যদি ভারতের বাইরের হয় তাহলে আমলাবাবুরা কী করবেন? ক্ষমতার অপব্যবহারের শিকার তবে কি কেবল দেশের মাধ্যমগুলিকেই হতে হবে?

আসলে মিডিয়ার স্বাধীনতা খর্ব করার ইচ্ছাটা সরকারের মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে। তাদের মনটা যে পড়ে আছে ইন্দিরা জমানার সেই ‘কমিটেড জুডিসিয়ারি ও কমিটেড প্রেস’-এর ধারণাতেই তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তথাকথিত স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থা ‘প্রসার ভারতী’র অধীনে আকাশবাণী ও দূরদর্শনকে ‘পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টার’ বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা হলেও আসলে এখনও তা ষোল আনা সরকারি সংস্থাই থেকে গিয়েছে। টাকা যখন যোগায় কেন্দ্রীয় সরকার, তখন রাশটা তো তারই হাতে থাকা স্বাভাবিক। অতএব কংগ্রেসের কথা না বলে কি সে বিজেপি বা অন্য কারও গুণ গাইবে? তার উপর এবার আবার রাজনৈতিক দলের টাকাও ঢুকেছে প্রসার ভারতী-র কোষে। নির্বাচনের আগে অন্যান্য মাধ্যমের সঙ্গে আকাশবাণী-দূরদর্শনেও ঢালাও বিজ্ঞাপন দিয়েছে কংগ্রেস। তুলনায় অন্যরা নগণ্যই। ‘সঙ্গত কারণেই’ সোনিয়া-রাহুল-মনমোহনের মুখ ও মুখনিঃসৃত বাণী বারবারই সংবাদে শোনাতে ও দেখাতে হয়েছে। অন্যদের ভাগ্যে ছিটেফোঁটা জোটেনি এমন দোষারোপের সুযোগ অবশ্য তারা রাখেনি।

‘কমিটেড প্রেস’ — এই কমিউনিস্ট সুলভ কংগ্রেসী তত্ত্বের কমিটমেন্টটা তাহলে কার কাছে? সবাইকে বলার জন্য যে উত্তর, তা হল ‘জনগণের কাছে’ হাল আমলের ‘আম আদমির কাছে’। আর যেটা সকলকে জানানোর জন্য নয়— তা হল, ‘ক্ষমতাসীন দলের কাছে’। নেহরু-গান্ধী পরিবারের সকলেই জানেন, বিশেষ করে ইন্দিরা গান্ধী জানতেন, আমাদের দেশে ‘ফ্রি প্রেস’ কথাটা একেবারেই ধোঁকাবাজি। খবরের কাগজ এবং ইদানীংকালের ইলেকট্রনিক মিডিয়া চালায় কিছু বৃহৎ শিল্পপতিই। ‘ফ্রিডম অফ্ প্রেস’ বলতে বোঝায় তাদেরই স্বাধীনতা। নানা স্বার্থে এরা সরকারের মুখাপেক্ষী। ফলে এদের নিয়ন্ত্রণে আনা সহজ। আর কান টানলে মাথা আসবেই। মালিকদের বাগে আনতে পারলে ‘গোলাম’ সাংবাদিকদের কথা ভাবতে হবে না। চৌত্রিশ বছর আগে জরুরি অবস্থার পরীক্ষাগারে তা যাচাইও হয়ে গিয়েছে। বেশির ভাগ সংবাদপত্র মালিক প্রথম দিন থেকেই ‘জো হুঁজুরানি’ বলে সেন্সরশিপের আদেশ মেনে নিয়েছেন। কেউ আবার দু’একদিন প্রচ্ছন্ন বিপ্লবীয়ানা দেখিয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত লড়ে গিয়েছেন দু’একজনই। মালিকরা সাধারণভাবে যে যুক্তিটা খাড়া করেছিলেন তা হল, সরকারের সঙ্গে লড়তে গিয়ে যদি ব্যবসাটায় তালা ঝোলে তবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে তো সাংবাদিক-অসাংবাদিকদেরই। এতগুলি লোক ও তাদের পরিবারের রুজি-রোজগারের প্রশ্ন যেখানে জড়িত, সেখানে সরকারের বিরুদ্ধে যাওয়াটা হঠকারিতা হয়ে যাবে। যুক্তির কিছুটা সারবত্তা থাকলেও প্রশ্নটা থেকেই যায় যে, সব মালিক যদি একযোগে রুখে দাঁড়াতেন, একসঙ্গে মিলে লঙ্ঘন করতেন অগণতান্ত্রিক বিধিনিষেধ, তাহলে কি সরকারের পক্ষে দেশজুড়ে পাইকারিভাবে সংবাদপত্রের ঝাঁপ বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হত? আসলে সংবাদপত্র মালিকরা সহজ রাস্তাটাই বেছে নিয়েছিলেন।

(এরপর ১৩ পাতায়)

তিন রাজ্যে মাওবাদীদের মুক্তাঞ্চল

(১ পাতার পর)

মাওবাদীদের পক্ষে প্রশস্ত বিরাট করিডর নির্মাণ সম্ভব হবে। তখন পুলিশের পক্ষে অ্যাকশন নেওয়া বেশ কঠিন হয়ে উঠবে। কেননা, সেক্ষেত্রে তিনটি প্রদেশের পুলিশকে যৌথভাবে স্ট্রাটেজি ঠিক করে অভিযানে নামতে হবে। এতদিন ধরে মাওবাদী হিংসাত্মক কাজকর্ম চালু থাকলেও দুটি প্রদেশের পুলিশ কখনও যৌথভাবে অভিযানে নামেনি। ফলে মাওবাদীরা দুটি প্রদেশের সীমানায় কোনও একটি প্রদেশে হামলা করে অন্য প্রদেশে ঢুকে পড়ে। এইসব কথা জানিয়েছেন অন্ধ্রের স্পেশ্যাল ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর ডি আই জি শিবাধর রেড্ডি। এই গোয়েন্দা শাখা অন্ধ্রপ্রদেশে কেবলমাত্র মাওবাদীদের নিয়েই কাজ করে থাকে। রেড্ডি র মতে এখন পরিস্থিতি বেশ কঠিন। তিনটি প্রদেশের পুরো এলাকা পুনরায় নিয়ন্ত্রণে আনতে কমপক্ষে দু’বছর সময় লাগবে এবং তা সম্ভব যদি এখনই একযোগে কাজ শুরু করা হয়।

কোরাপুট এবং মালকানগিরি জেলায় মাওবাদী হামলা এবং দৌরাত্ম্য ইতিমধ্যেই রাজ্য প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়াও তাই। দান্তেওয়াড়াকে মাওবাদীদের ডেরা বলা হয়। অন্ধ্রপ্রদেশ-ওড়িশার বর্ডার দিয়ে যদি জঙ্গল বরাবর তারা কোরাপুট ও মালকানগিরি হয়ে খাম্মাম জেলার সীমা ঘেঁষে ছত্তিশগড়-অন্ধ্রপ্রদেশ যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে তাহলেই বিশাল এলাকা মাওবাদীদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে বলেই শ্রীরেড্ডির বক্তব্য। মালকানগিরি জেলার এস পি সত্যব্রত ভয় জানিয়েছেন, গত দু’মাসে জেলার অন্ধ্র-ওড়িশা সীমান্তে মাওবাদীদের গতিবিধি বেড়েছে। অন্ধ্র ও ছত্তিশগড়ে যাতায়াতের জন্য মাওবাদীরা ওড়িশার মালকানগিরি ও কোরাপুট জেলাকে প্যাসেজ হিসাবে ব্যবহার করছে। ছত্তিশগড়ে হামলা করেই তারা ওড়িশার মালকানগিরিতে ঢুকে পড়ে। অন্ধ্রপ্রদেশ-ওড়িশা সীমান্তে আত্মগোপন করে।

কোরাপুট জেলার নারায়ণপাটনাতে তারা ট্রানজিট ক্যাম্প বানিয়েছে। ওখান থেকে সহজেই তাদের শক্ত ঘাঁটি বিশাখাপত্তনম্ জেলাতে ঢুকে পড়া যায়। এখান থেকেই তারা ছত্তিশগড় ও ঝাড়খন্ডে ক্যাডারদের কাছে নির্দেশ পাঠায়। অন্ধ্রের খাম্মাম জেলার সীমান্ত বরাবর ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া এবং ওড়িশার মালকানগিরি জেলায় মাওবাদীদের গতিবিধি সম্প্রতি বেশ বেড়েছে। এই এলাকার জঙ্গলে শিবির তৈরি করে তারা প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে। খাম্মাম জেলাকে দুভাগ করে বয়ে গেছে গোদাবরী। উত্তরে গভীর ঘন জঙ্গল। লেগে আছে দান্তেওয়াড়া এবং মালকানগিরি জেলার সীমা। নদী থাকার ফলে হঠাৎ করে পৌঁছানো যায় না। মাওবাদীরা তিনটি প্রদেশের তিনটি জেলাকে ঘাঁটি করে পুরো এলাকার নিয়ন্ত্রণ পেতে চাইছে।

মূল্যবৃদ্ধি আকাশছোঁয়া

(১ পাতার পর)

কোথাও আর অনাবৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়নি, সুতরাং এরকম মূল্যবৃদ্ধি অস্বাভাবিক।

এর জন্য অর্থনীতিবিদরা দায়ী করছেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক অপদার্থতাকেই। দাম বাড়ার এই পুরো ব্যাপারটাকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। মূল্যবৃদ্ধি যদি অনিবার্যই হয় তবে মুদ্রাস্ফীতির হার মাইনাসে পৌঁছবে কি করে? অর্থনীতির কোনও সূত্রেই এই উদ্ভট তত্ত্বের কোনও ব্যাখ্যা মিলবে না।

আগেই লেখা হয়েছে, গত বছর জুলাই মাস নাগাদ মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ১১.৪২ শতাংশ। সেই সময় চিনির দর ছিল কেজি প্রতি ১৮ টাকা। আজ যা কেজি প্রতি ২৮ টাকায় গিয়ে পৌঁছেছে। একইভাবে অড়হর ডালের দামও কেজি প্রতি ৩০ টাকা বেড়েছে গত বছরের তুলনায়। তবে এর মূল্যবৃদ্ধি টা একটু আশ্চর্যজনক। এই বছরের গত জুন মাসে অড়হর ডালের দাম ছিল কেজি প্রতি ৬৩ টাকা। ৪ জুলাই নাগাদ এর দাম আচমকা একলাফে বেড়ে হয় ৬৮ টাকা। সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই আবারই ভয়ানকভাবে বেড়ে গেল অড়হর ডালের দাম। ১০ জুলাই নাগাদ এর দাম হল কেজি প্রতি ৭৬ টাকা। (তথ্যসূত্র : কেন্দ্রীয় ভান্ডার রেটস অন কমোডিটিস)। একমাত্র চালের দাম ছাড়া মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে সবকিছুরই। তথ্যসারণী দেখে নিলেই তা মালুম হবে। (প্রথম পৃষ্ঠায় সারণী দ্রষ্টব্য)

প্রদত্ত তথ্যসারণী থেকে একটা জিনিস প্রমাণ হয়, মুদ্রাস্ফীতি গত এক বছরে বিপুল হারে কমেছে, পক্ষান্তরে জিনিসপত্রের দাম গত এক বছরে কিন্তু ব্যাপক হারে বেড়েছে। অর্থনীতির এই চমৎকার সূত্রটি আবিষ্কারের চিরকালীন কৃতিত্বটা (দুষ্টু লোকেরা যদিও একে ভাঁওতাবাজী ও অপদার্থতা বলছেন) কিন্তু নিজের কাঁধে তুলেই ফেলেছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ তথা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং।

তোষণের রাজনীতিতেই দাঙ্গা মুর্শিদাবাদে

(১ পাতার পর)

ও ত্রিমোহিনীতে কী হয়েছিল তা ‘স্বস্তিকার’ পাঠকরা অনেকেই ইতিমধ্যে জেনেছেন। কলকাতায় আমরা নিজস্ব সংবাদসূত্র মারফৎ টেলিফোনে যতটুকু শুনেছি তাই এখানে লিখছি। তথ্যে যদি কোনও ভুল থাকে তবে বেলডাঙ্গার পাঠকেরা দয়া করে শুধরে দেবেন। স্থানীয় ঝাউবোনা হাইস্কুলে শুক্রবার দুপুরে নামাজ পড়াকে কেন্দ্র করে হিন্দু বিরোধী দাঙ্গার সূত্রপাত। এই হাইস্কুলে প্রায় এক হাজার ছাত্র পড়ে। এর মধ্যে ৫০ শতাংশ মুসলিম ছাত্র। চলতি বছরের শুরু থেকেই এই মুসলিম ছাত্ররা দাবী জানাচ্ছিল যে জুম্মাবারে তাদের স্কুল প্রাঙ্গণে নমাজ পড়তে দিতে হবে। কোনও স্কুলই মসজিদ নয় যে সেখানে জুম্মার নমাজ পড়তে দিতে হবে। স্কুল পরিচালন কর্তৃপক্ষ রাজি না হলে মুসলিম ছাত্ররা চাপ সৃষ্টি করে গত ফেব্রুয়ারি মাসে সরস্বতী পূজা বন্ধ করে দেয়।

ঘটনা এখানেই থেমে থাকে না। লোকসভা নির্বাচনের পর প্রণববাবু অধীরবাবুরা মুসলমান ভোটদাতাদের খুশি করতে ওভারটাইম খাটতে শুরু করেন। কারণ, ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাদের দোয়া চাই। স্থানীয় ত্রিমোহিনী মাদ্রাসাতে গোপন সভায় ঠিক হয় ঝাউবোনা হাইস্কুলে জোর করে নমাজ পড়া হবে। এরপরেই ১০ জুলাই শুক্রবার দুপুরে মুসলিম ছাত্ররা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের আপত্তি উপেক্ষা করে নমাজ পাঠের ব্যবস্থা করে। অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্রেরা বাধা দিলে তারা মোবাইল ফোনে মাদ্রাসায় আগে থেকে প্রস্তুত সশস্ত্র দাঙ্গাবাজদের বিদ্যালয়ে ডেকে আনে। শুরু হয়ে যায় বেপরোয়া আক্রমণ। শিক্ষক ও হিন্দু ছাত্রদের পিটিয়ে আধমরা করা হয়। বহু ছাত্র ছুরিকাহত হয়। এরপর দাঙ্গাবাজদের দল ত্রিমোহিণী বাজারে হিন্দুদের দোকান লুঠ ও আগুন লাগায়। বাধা দিতে গেলে হিন্দু ব্যবসায়ীদের গুলি করে হত্যা করা হয়। ঝাউবোনা গ্রামে বেছে বেছে হিন্দুদের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়। একটি বাড়িতে আগুনে পুড়ে একটি পরিবারের চারজন মারা যান। মোট ১২ জন হিন্দু এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত দাঙ্গায় নিহত হয়েছেন।

পুলিশ ও র‍্যাফ বাহিনীর সদস্যরা সশস্ত্র দাঙ্গাবাজদের দাপটে পিছু হঠলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বি এস এফ ও সি আর পি এফ বাহিনীকে তলব করা হয়। বেগুনবাড়ির কাছে পথে দুটি যাত্রীবাহী বাস ও একটি মাট্যাডোর ভ্যানে দাঙ্গাবাজরা আগুন দেয়। একটি টাটা সুমো গাড়িতে একটি হিন্দু পরিবারের কয়েকজন যাচ্ছিলেন। দাঙ্গাবাজরা গাড়িটি থামাতে গুলি চালায়। কিন্তু গাড়ির চালক গুলি বৃষ্টি উপেক্ষা করে যাত্রীসহ বেলডাঙ্গার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ভবনে আশ্রয় নেয়। এতে দাঙ্গাবাজরা ক্ষিপ্ত হয়। পরেরদিন গুজব ছড়ায় যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ভবনে আক্রমণ চালাতে সশস্ত্র দাঙ্গাবাজরা তৈরি হয়েছে।

এই খবর শুনে স্থানীয় হিন্দুরা প্রতিরোধে সঙ্ঘবদ্ধ হলে দাঙ্গাবাজরা পিছু হটে। কিন্তু এই পিছু হটাটা সাময়িক। কংগ্রেসের তোষণ নীতি মুর্শিদাবাদ জেলায় যে জাতি বিভাজন ঘটিয়েছে তার ফলে বেলডাঙ্গা, নওদা এবং হরিহরপাড়ায় হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা কঠিন।

রাজ্য রাজনীতি

ভাঙনের মুখে বুদ্ধ-বিমান-বিনয়-শ্যামল-নিরুপম অ্যাণ্ড কোম্পানী

নিশাকর সোম

রাজ্য-রাজনীতিতে অচিরেই বামফ্রন্টের মধ্যে ঝড় উঠবে। হয়ত বামফ্রন্ট ভেঙে যেতে পারে। কিরণময় নন্দ বামফ্রন্টের সভায় এবং মন্ত্রিসভার বৈঠকে বস্তুত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্যকে প্রতিটি কথায় নস্যাৎ করে দিয়েছেন। শোনা যেতো কিরণময় নন্দ নাকি বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসুর ভক্ত। কিরণময় বাবু সোস্যালিস্ট পার্টির সম্মেলনে বিমান বসুকে বক্তা করেছিলেন। এহেন কিরণময়বাবুকে বিমান বসু আলাদা আলোচনায় ডেকেও সামলাতে পারছেন না। শোনা যাচ্ছে কিরণময়বাবু নাকি তৃণমূলের শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছেন! সময় মতো তিনি অন্যপথে হাঁটতে পারেন। কিরণময়বাবু তাঁর পার্টির লোকজনকে বলেছেন যে সিপিএম-কর্মীরা বছরের পর বছর জলাশয়-পুকুর-ঝিল বোজানোর কাজে প্রমোটারদের সাহায্য করেছে। সিপিএম নেতৃত্বকে জানিয়েও কিছু হয়নি। তিনি আরও বলেছেন যে, সিপিএম-এর সঙ্গে থাকলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনা নেই। কাজেই জেতার জন্য যে পন্থা নেবার তা নিতে হবে। যাদের সঙ্গেই যাওয়া হোক না কেন — তাঁর পার্টির দু'টো সীট নিশ্চিত করতে হবে। বামফ্রন্টের ভাঙনের এটাই প্রাথমিক লক্ষণ। কিরণময়বাবুর ক্ষোভের কারণ হল তিনি সিপিএম-কে বরাবর সমর্থন করে এসেছেন। তার বদলে সিপিএম তাদের অবজ্ঞা করে বড় পার্টিগুলির খোসামোদ করেছে। অবশ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে কিরণময়বাবু বেশ কয়েকটা কেন্দ্রে সিপিএম-কে যথেষ্ট বেগ দিয়েছিলেন এবং পরাজিত করেছেন।

এবার বামফ্রন্টের আর এক সিপিএম-ভক্ত পার্টির কথা শুনুন। সেই পার্টির মন্ত্রী হলেন প্রতীম চ্যাটার্জি, দমকল মন্ত্রী। তিনি বামফ্রন্টের সভায় মাওবাদীদের সম্পর্কে কেন্দ্রের অবস্থানের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ঐক্যমত্য হওয়া সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এই প্রয়োগ করা চলবে না। প্রতীম চ্যাটার্জি এমন কথাও নাকি বলেন যে, তিনি যা রোজগার করতে পারেন তাতে মন্ত্রী না থাকলেও অসুবিধা হবে না। উল্লেখ্য, প্রতীমবাবু ডায়মন্ড মার্চেন্ট। আরও উল্লেখ্য, প্রতীমবাবুর সঙ্গে মানিকতলার প্রাক্তন বিধায়ক পরেশ পালের ঘনিষ্ঠতা আছে। তিনি নাকি পরেশ পালের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতে অস্বীকার করেছিলেন। প্রতীমবাবু একজন অভিনেতা, তিনি টিভি সিরিয়াল এবং বড় ছবিতেও অভিনয় করে থাকেন। তাঁর সঙ্গে অন্যতম চিত্র পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠতা আছে। হরনাথবাবু আবার সুভাষ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ। বিগত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের বিপুল জয়ের পরই হরনাথবাবু পুষ্প-মিষ্টান্ন নিয়ে মমতা ব্যানার্জির কাছে যান এবং তাঁকে নাকি প্রণাম করেন। শোনা যাচ্ছে এই হরনাথবাবুর মারফৎ নাকি প্রতীম চ্যাটার্জি মমতাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন হরনাথবাবু ও প্রতীমবাবু অভিনয় সূত্রে খুবই ঘনিষ্ঠ।

এটি হল বামফ্রন্ট ভাঙার দ্বিতীয় লক্ষণ। আর এস পি-এর মন্ত্রী ও নেতা ক্ষিতি গোস্বামী বামফ্রন্টের সভায় স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, একমাত্র সিপিএম-এর দুষ্কর্মের জন্যই বামফ্রন্ট মুসকিলে পড়েছে। আর এর জন্য প্রধানত দায়ী মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বিমানবাবুর সমালোচনা করে বলেন, তিনি বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান হলেও সিপিএম-এর একদলীয় সিদ্ধান্তকে বামফ্রন্টের শিলমোহর লাগাতে থাকেন। এটা বামফ্রন্টের ঐক্য বিরোধী। আর এস পি নেতৃবৃন্দ দিল্লীতে মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাদের সাংসদ প্রশান্তবাবু মমতাদেবীকে নানা প্রস্তাব দিয়েছেন। মমতাদেবীও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন বলে দিয়েছেন। আর এস পি দলের মধ্যে মোটামুটি সিদ্ধান্ত হয়েছে সিপিএম-এর বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখা, তারপর কোনও এক ইস্যুতে বামফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে আসা। স্মরণীয় ১৯৭১ সালে আর এস পি স্বতন্ত্র ছিল এবং সিপিএম-এর বিরুদ্ধে প্রতিটি কেন্দ্রেই প্রার্থী দিয়েছিল। যার ফলে শিয়ালদহে এবং বড়তলায় সিপিএম প্রার্থীর পরাজয় নিশ্চিত হয়েছিল।

আর এস পি দলের মধ্যে মোটামুটি সিদ্ধান্ত হয়েছে সিপিএম-এর বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখা, তারপর কোনও এক ইস্যুতে বামফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে আসা। স্মরণীয় ১৯৭১ সালে আর এস পি স্বতন্ত্র ছিল এবং সিপিএম-এর বিরুদ্ধে প্রতিটি কেন্দ্রেই প্রার্থী দিয়েছিল। যার ফলে শিয়ালদহে এবং বটতলায় সিপিএম প্রার্থীর পরাজয় নিশ্চিত হয়েছিল।

বামফ্রন্টের ভাঙনের এটি তৃতীয় লক্ষণ। এখানে একটি পুরানো কাহিনী বলতে ইচ্ছা করলো — তখন আমি সাংবাদিক হিসেবে ক্রান্তি প্রেসে যেতাম — শ্রদ্ধেয় মাখন পাল এবং ননী ভট্টাচার্য অনেক খবরা-খবর দিতেন। এছাড়া কান্তি চৌধুরী আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন। এই কান্তি চৌধুরীই বেঙ্গল ল্যাম্প তথা জ্যোতি বসুর পুত্র ইত্যাদি ঘটনা যতীন চক্রবর্তীকে দেন। এর শেষ পরিণতি হয় আর এস পি থেকে যতীন চক্রবর্তীর বহিষ্কার। এর কিছু আগে একদিন মাখনদা আমায় বলেন যে, তিনি আর বামফ্রন্টের সভায় যাবেন না। কারণ পরে জানতে পারি, সিপিএমের উঠতি নেতাদের একজন (কেউ কেউ বলেন বিমান বসু) মাখনদা-কে দেখে চেয়ার না ছেড়ে চেয়ারে বসে বসেই কথা বলেন। সেদিনই মাখনবাবু প্রমোদ দাশগুপ্তকে বলেন — "আমাদের আর বামফ্রন্টের সভায় আসার দিন ফুরিয়ে গেছে।" অনুশীলন পার্টির সূত্রে প্রমোদবাবুর সঙ্গে মাখন পালের ঘনিষ্ঠতা ছিল। আর মজার কথা হল যে, মানিকতলার তৃণমূল নেতা পরেশ পাল মাখন পালের মানস পুত্র বলে পরিচিত। এটি বামফ্রন্ট ভাঙার আর একটি কারণ হবে।

সিপিআই-এর জাতীয় পরিষদ এই রাজ্যের নির্বাচনী বিপর্যয়ের জন্য সিপিএমের একদলীয় শাসন, সিপিএম নেতা-কর্মী-মন্ত্রীদের ঔদ্ধত্য, ভুল ভূমিনীতি, জনজাতি এলাকায় উন্নয়ণ না করা, শিল্পনীতিকে দায়ী করেছে। সিপিআই সাধারণ সম্পাদক এ বি বর্ধন সিপিএম-এর চাঁছাছোলা সমালোচনা করেছেন। এখানেও উল্লেখ করা যায় ১৯৭১ সালে সিপিআই একলা ছিল। শিয়ালদহে সিপিএম প্রার্থীকে পরাজিত করার জন্য নন্দ ভট্টাচার্যকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। সিপিআইও মমতা দেবীর রেল বাজেটের পক্ষেই আছে। এছাড়া সিপিআই-এর নেতা-মন্ত্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য বুদ্ধ বাবুকে মন্ত্রিসভার বৈঠকে তীব্র সমালোচনা করেছেন। এমন কথাও নাকি বলেছেন যে, বুদ্ধ বাবুর থেকে তিনি বহু বছর আগেই কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। প্রতীমবাবু-কিরণময়বাবু নন্দবাবু-ক্ষিতিবাবুরা বলেছেন তাঁরা কারুর দয়াতে মন্ত্রী হননি, নিজেদের পার্টির শক্তিতে মন্ত্রিত্বের আহ্বান পেয়েছিলেন।

ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রবীণ নেতা অশোক ঘোষ, বিমান বসুর কথায় শান্ত হলেও ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মী নেতারা বামফ্রন্ট ছেড়ে আসার, মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন। এই কারণে এই দলও বামফ্রন্টের বাইরে চলে যাবে।

উপরের সংবাদগুলি থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে বামফ্রন্ট এবং মন্ত্রিসভায় সিপিএম নিঃসঙ্গ। এ-ছাড়া বামফ্রন্ট অন্ততঃপক্ষে তিনটি আলাদা ফ্রন্ট করবে, আর দু'টি পার্টি তো তৃণমূলের সঙ্গে রাজনৈতিক "মউ" করবে। ভাঙন আসবেই ফ্রন্টে।

সংবাদগুলি থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে বামফ্রন্ট এবং মন্ত্রিসভায় সিপিএম নিঃসঙ্গ। এ-ছাড়া বামফ্রন্ট অন্ততঃপক্ষে তিনটি আলাদা ফ্রন্ট করবে, আর দু'টি পার্টি তো তৃণমূলের সঙ্গে রাজনৈতিক "মউ" করবে। ভাঙন আসবেই ফ্রন্টে। যেমন ভাঙন এসেছে রাজ্যের আমলা এবং পুলিশের মধ্যে।

যেমন ভাঙন এসেছে রাজ্যের আমলা এবং পুলিশের মধ্যে। পুলিশের একাংশ ইতিমধ্যেই ধরে নিয়েছে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জোট ক্ষমতায় আসছে। তাই মহাকরণের পুলিশ অফিসাররা মন্ত্রীদের আর হিসাবের মধ্যেই ধরেন না। পার্থ চ্যাটার্জি-কে কোনও পুলিশ কর্মী বলেন "স্যার, আপনি তো পুলিশ মন্ত্রী হবেন।" পুলিশের মধ্যে তৃণমূলের সংগঠন গড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পার্থ চ্যাটার্জিকে। ইতিমধ্যে নাকি এস পি স্তরের একাধিক পুলিশ অফিসার মমতার সঙ্গে যোগাযোগ করে চলেছেন বলে তৃণমূল সূত্রে জানা গেছে।

সরকারি আমলাদেরও একাংশ তৃণমূলের দিকে যাচ্ছেন। আপাতত তাঁরা নিজেদের দিল্লীতে সরিয়ে নিয়ে যেতে উদগ্রীব।

(এরপর ৮ পাতায়)

অন্য রকম

গাড়ি পুরুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সত্যিই তিনি ব্যতিক্রমী। ব্যতিক্রমী তাঁর উদ্ভাবনী গুণ। ভিন্নধর্মী তাঁর চিন্তাভাবনাও। হায়দরাবাদের কানাবোইনা সুধাকর। শুধু বাইক চালানো নয়, বাইক তৈরির নেশাটাও তাঁর ঘাড়ে চেপেছিল কম বয়সে। শুরু থেকেই বিভিন্ন আকৃতির মোটরগাড়ির স্বপ্ন দেখেছিলেন সুধাকর। জীবনের ৪২ বছরের মধ্যে ৩২টা বছর তাঁর কেটে গেছে এই নেশায়। নিজের ইচ্ছামতো, খুশি মাফিক তৈরি করেছেন একের পর এক গাড়ি। সব সময় সফলও হয়েছেন সুধাকর। তবে কোনও গাড়িই খেলনাপাতির গাড়ি নয়। সবের মধ্যেই প্রাণ দিয়েছেন তিনি। ব্যবহার করেছেন সিসি ক্ষমতা সম্পন্ন মোটরগাড়ি। কখনও ফুটবলের আদলে। কখনও বা সিগারেটের সাইজে। ক্যামেরার আদলেও গাড়ি তৈরি করেছেন সুধাকর। সুধাকরবাবুর এই সব উদ্ভাবনীশক্তি স্বভাবসুলভ। কোনও পেশাগত প্রশিক্ষণে তিনি প্রশিক্ষিত নন। মনের ইচ্ছাতেই তৈরি করেছেন একের পর এক সৃষ্টি। সিগারেটের সাইজে গাড়ি তৈরি করে তাক লাগিয়ে দেন তিনি। সিগারেট খাওয়া বিপজ্জনক সেই সতর্কবাণীও খোদাই করে রেখেছেন গাড়ির গায়ে। একদিকে ইচ্ছাশক্তি, অন্যদিকে সমাজ সচেতনতার এক অদ্ভূত মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তিনি।

বিভিন্ন গাড়ির সঙ্গে সুধাকর।

এসব তৈরিতে খরচও কম হয় না তাঁর। হাজার হাজার টাকার গল্প জড়িয়ে রয়েছে এসবে। টাকা আসে কোথা থেকে? সুধাকরবাবুদের ছাপাখানা রয়েছে। ছাপাখানার উপার্জিত টাকা কাজে লাগান তিনি। নিজের টাকায় এক সংগ্রহশালাও খুলেছেন। সেখানে জায়গা করে নিয়েছে তাঁর ৩২ বছরের উদ্ভাবনী গাড়ি সমগ্র। কাতারে কাতারে অনেক মানুষই আসেন সেসব দেখতে। চাক্ষুষ করেন সুধাকরের উদ্ভাবনী গুণ। সেই সঙ্গে গাড়ি-পুরুষকেও দেখার সৌভাগ্য হয় তাঁদের।

দক্ষিণ দিনাজপুরে উদ্ধারপ্রাপ্ত মূর্তি।

উত্তরবঙ্গে প্রাচীন মূর্তি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় কাস্টমস্ দপ্তরের শিলিগুড়ি বিভাগের আধিকারিকরা সম্প্রতি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় হানা দিয়ে পাঁচটি দুর্লভ প্রাচীন মূর্তি উদ্ধার করেছেন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ঝাবরগাছি গ্রামের কাছে রাস্তার ধারেই মাটির নীচে পুঁতে রাখা ছিল ওই প্রাচীন মূর্তিগুলি। প্রতিটি মূর্তির ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে।

তবে তিনটি মূর্তি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, বাদবাকী দু'টি অক্ষত রয়েছে। শিলিগুড়ি বিভাগের কাস্টমস্ অফিসার জ্যোতিকুমার এই সংবাদ জানিয়েছেন। এখনও অবধি দুস্কৃতীদের কাউকেই ধরা যায়নি। প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গে অনেক প্রাচীন মূর্তি রয়েছে। এক আন্তর্জাতিক পাচারকারী চক্র মূর্তি পাচারে সক্রিয়। কয়েকবছর আগে কোচবিহারের রাজবাড়ির মদনমোহন মন্দিরের মদনমোহন মূর্তি পাহারা থাকা অবস্থায় চুরি হয়। আজ পর্যন্ত তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কোচবিহারবাসীরা আন্দোলনে নামলে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। গায়ের জোরে আন্দোলন দমন করেছিল। সম্প্রতি প্রাপ্ত একটি মূর্তি ভগবান সূর্যের যা চতুর্থ শতাব্দীর, চামুণ্ডা দেবীমূর্তিটি পঞ্চম শতাব্দীর, ভগবান বিদ্যাধরের মূর্তিটি ষষ্ঠ শতাব্দীর, লক্ষ্মী দেবীর মূর্তিটি নবম শতাব্দীর হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

শিক্ষা দপ্তরের গড়িমসিতে হাইস্কুল হচ্ছে না উঃ দিনাজপুরে

মহাবীর প্রসাদ টোডি ।। উত্তর দিনাজপুর জেলায় জুনিয়র হাইস্কুলের জন্য ৪ কোটি টাকা এক বছর ধরে এসে পড়ে থাকলেও জুনিয়র হাইস্কুল তৈরির কাজ কিছুই হয়নি। প্রকাশ যে, ২০০৮-২০০৯ শিক্ষা বছরে জেলায় ৭৩টি জুনিয়ার হাইস্কুল তৈরির জন্য প্রায় চার কোটি টাকা আসে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত একটি মাত্র স্কুলের ঘর তৈরি হয়েছে। আর ২০টি স্কুলের নির্মাণ কার্য চলছে। এদিকে স্কুলের কাজ করা নিয়ে জেলা শিক্ষা দপ্তরের বিরুদ্ধে গড়িমসির অভিযোগ উঠেছে। জেলা শিক্ষা দপ্তর অবশ্য জানিয়েছে যে, জমির সমস্যার জন্যই এই কাজ করা যাচ্ছে না। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে যে, জেলায় শিক্ষার হাল ফেরাতে গত শিক্ষাবর্ষে রাজ্য সরকার ৭৩টি জুনিয়ার হাইস্কুল তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্য রাজ্য সরকার ৮ কোটি ১০ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা বরাদ্দও করেছে। আর প্রথম ধাপের প্রতিটি স্কুলের জন্য ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার করে টাকা জেলা শিক্ষা দপ্তরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই টাকার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট (ইউ সি) জমা করলেই দ্বিতীয় ধাপে স্কুল প্রতি আরও ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

কালিয়াগঞ্জ ব্লকে ১০টি, রায়গঞ্জে ৩টি, ইটাহারে ৬টি, করণদিঘীতে ৮টি ও হেমতাবাদে ৫টি সহ জেলার ৯টি ব্লকেই ওই স্কুল নির্মাণ হওয়ার কথা। জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ তথা কংগ্রেসের জেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ মুস্তাফা বলেন, প্রায় ৪ কোটি টাকা শিক্ষা দপ্তরের হাতে রয়েছে। আসলে সরকার এ বিষয়ে কতটা আগ্রহী তা নিয়েই তাদের প্রশ্ন রয়েছে। কারণ যারা জমিদাতা তারা জমির বদলে চাকরি চাইছেন। কিন্তু সরকার তা দিতে রাজি নয়। ফলে স্কুলগুলি আদৌ তৈরি হবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। সরকারের পরিকল্পনা ও শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগের অভাবেই সার্বিকভাবে প্রকল্পটি রূপায়ণ করা যাচ্ছে না যথাযথভাবে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং জেলা শিক্ষা দপ্তর কাজে গতি কম থাকার কথা স্বীকার করলেও নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ কিন্তু মানতে চাননি।

বিরোধীদের অভিযোগ বাজেটে উপেক্ষিত অসম

সংবাদদাতা ।। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণববাবু যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে কংগ্রেস বাদে অসমের তাবৎ রাজনৈতিক দলই অসন্তুষ্ট এবং যার পরনাই ক্ষুব্ধ। অগপ (অসম গণ পরিষদ), বিজেপি, এ ইউ ডি এফ নেতারা প্রকাশ্যেই এই বাজেটের কড়া সমালোচনা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য — বিশেষ শ্রেণীর রাজ্যের তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অসমকে বাজেটে বঞ্চিত করা হয়েছে। অসম বিধানসভার বিরোধী দলনেতা এবং অগপ দলের সভাপতি চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি গত ৬ জুলাই সাংবাদিকদের বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গকে আয়লা ত্রাণে এক হাজার কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ, মহারাষ্ট্রকে স্পেশাল প্যাকেজ দেওয়া হলেও ফি-বছর বন্যা ও ভূমিক্ষয়ে জর্জরিত অসমকে একেবারে অবহেলা করা হয়েছে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত রাজ্য হওয়াতে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশেষ আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে। অথচ অসমের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোনও আর্থিক বন্দোবস্ত করা হয়নি।

শ্রীপাটোয়ারি আরও বলেছেন, মোট বাজেট বরাদ্দের মাত্র সাত শতাংশ কৃষিক্ষেত্রের জন্য, যা একেবারেই অপর্যাপ্ত। এটা দিয়ে কৃষিক্ষেত্রের পরিকাঠামোর উন্নয়ণ করা সম্ভব নয়। কৃষিঋণে সুদের হার সাত শতাংশের বদলে ৩/৪ শতাংশ করা উচিৎ ছিল।

বিজেপি সাংসদ কবীন্দ্র পুরকায়স্থও এবছরের বাজেটের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পে মজুরী বাড়ালেও তার লাভ সাধারণ মানুষ পাবে না, অফিসারদের পকেটে চলে যাবে। এই প্রসঙ্গে তিনি এনরেগা আইনের কথা উল্লেখ করেন।

এ ইউ ডি এফ নেতা আদিত্য লাংথাসার কথা হল, প্রধানমন্ত্রী যখন অসমে আসেন তখন তিনি অসমের বন্যা ও ভূমিক্ষয়ের জন্য হাহুতাশ করেন। অথচ বাজেটে প্রতিকারের জন্য কোনও অর্থ বরাদ্দ নেই। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং অসম থেকেই রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যদিকে অসম কংগ্রেস দলীয় স্বার্থের উপরে গিয়ে রাজ্যবাসীর কথা ভাবতেই পারেনি। দল বলছে বাজেটে ভারসাম্য বজায় আছে এবং গরীব ও নীচের তলার মানুষের পক্ষে কল্যাণকর।

মণিপুর-এর সাংসদ রিসাং কেইসিং এবং সিকিমের সাংসদ ও টি লেপচা বাজেটের তেমন সমালোচনা না করলেও তাদের বক্তব্য হল, বাজেটে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য কিছুই নেই।

গুণমান পরীক্ষা ছাড়াই বাংলাদেশী খাদ্যপণ্যের ব্যবসা ত্রিপুরায়

সংবাদদাতা ।। বাংলাদেশী পণ্য ত্রিপুরা ও অসমের বাজার ছেয়ে ফেলছে। সরকারি, বেসরকারি কোনও নিয়ন্ত্রণই কাজ করছে না। অবাধে বাজারে বিকোচ্ছে, এপারের লোকেরা কিনছে। এর মধ্যে নরম পানীয়, বাংলাদেশী সাবান এবং খাদ্য জাতীয় পণ্যই বেশী। খোঁজ করলে দেখা যাবে শিলিগুড়ি এবং কলকাতার বাজারেও ওইসব বাংলাদেশী ভোগ্যপণ্য বিক্রি হচ্ছে।

ঘটনা হল, গুণমান পরীক্ষা না করেই ব্যাপকহারে ওপারে বাংলাদেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য এবং খাদ্যজাতীয় পণ্য ত্রিপুরায় আমদানী হচ্ছে। পড়শী বাংলাদেশের সাথে রাজ্যের আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য ক্রমশ ফুলে-ফেঁপে উঠলেও আজও রাজ্য প্রশাসন থেকে আমদানীকৃত এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য কিংবা খাদ্যপণ্য সামগ্রী পরীক্ষা করার কোনও ধরনের পরিকাঠামো তৈরি করা হয়নি। এমনকী খাদ্যদ্রব্য কিংবা খাদ্যপণ্য সামগ্রী পরীক্ষা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোন দপ্তরের দায়িত্বে, এ বিষয়টিও স্পষ্ট নয়। ফলে মাছ থেকে শুরু করে ওপারের প্যাকেটজাত খাদ্যের গুণমান পরীক্ষা ছাড়াই রাজ্যে বাজারজাত হচ্ছে।

এক্ষেত্রে প্রথম যে অভিযোগটি উঠেছে তা হল ইলিশ মাছ নিয়ে। রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে যে পরিমাণ ইলিশ মাছ পাওয়া যায় তা মূলত বাংলাদেশ থেকেই আমদানী হয়ে থাকে। রাজ্য খাদ্য দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিকের মতে বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীরা জাপানসহ বিভিন্ন দেশেই ইলিশ মাছ রপ্তানী করে থাকে। তার জন্য বেশ কিছু পরীক্ষার পর তবে মাছগুলোকে রপ্তানী করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে যে পরিমাণ ইলিশ মাছে রপ্তানীর গুণমান থাকে না সে সমস্ত মাছগুলো ত্রিপুরার বাজারে আসে। আমাদের এখানে ইলিশ মাছের একটা অংশ বৈধভাবে আমদানী হলেও এখনও একটা বড় অংশ আমদানী হয়ে থাকে যার গুণমান পরীক্ষা করার মতো কোনও ব্যবস্থা আজও চালু হয়নি। অথচ বিলোনীয়া থেকে উত্তর জেলার রাগনা পর্যন্ত আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য কেন্দ্র কিন্তু রাজ্য সরকারই চালু করেছে। ফলে আগরতলাসহ রাজ্যের মানুষকে গুণমান পরীক্ষা ছাড়াই পড়শী রাজ্যের মাছ থেকে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যও গ্রহণ করতে হচ্ছে। এ বিষয়ে খাদ্য দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা হলে এক শীর্ষ আধিকারিক স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে বিষয়টি পুরসভার এক্তিয়ারে। পুরসভার স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ স্বপন চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান, খার্চি মেলায় ব্যস্ত আছেন। অগত্যা পুরসভার ফুড ইন্সপেক্টর শ্রীঅধিকারীর কোর্টেই বিষয়টি ঠেলে দেন। শ্রীঅধিকারীর সাথে কথা হলে তিনি স্বীকার করেন, এ ধরনের কোনও পরীক্ষার ব্যবস্থা এখনো চালু হয়েছে কিনা তাঁর জানা নেই। তবে একসময় পাবলিক এনালিস্ট থেকে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হতো। এখন তাও বন্ধ রয়েছে। কবে নাগাদ চালু হবে তারও কোনও ঠিক ঠিকানা নেই। ফুড ইন্সপেক্টর শ্রীঅধিকারী পরামর্শ দিলেন, এ বিষয়ে জানতে হলে স্বাস্থ্য দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করুন। জানা গেল — স্বাস্থ্য অধিকর্তা ম্যারাথন বৈঠকে ব্যস্ত। ফলে স্বাস্থ্য দপ্তরের বক্তব্য অজানাই থেকে গেল। ঘটনা, শ্রীমন্তপুর কিংবা আগরতলা-আখাউড়া সীমান্তে এখনও খাদ্যদ্রব্য কিংবা খাদ্যপণ্য পরীক্ষার কোনও ব্যবস্থা নেই, পুরসভার দুই আধিকারিকই তা স্বীকার করেন।

মায়াবতীর মূর্তি ম্যানিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ফের বিতর্কেমায়াবতী। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী রাজ্যজুড়ে নিজের মূর্তি বসিয়ে সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্টের রোষানলে পড়েছেন। সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে ভুরিভুরি স্ট্যাচু বসিয়েছেন বহিনজী। সরকারি কোষাগার থেকে এই বাবদ খরচ হওয়ার পরিমাণ ২ হাজার কোটি টাকা বলে জানা গেছে। এই বিতর্কের মাঝে ঢালাও সরকারি বাংলো থেকে ঝাঁ চকচকে দপ্তর খোলারও তোড়জোড় শুরু করছেন মায়াবতী। যার মধ্যে রয়েছে ৬টি বাংলো ও প্রায় ১২টি মতো অফিস খোলার কর্মসূচী। খোদ সুপ্রীম কোর্টও সরকারের জনগণের টাকার এমন অপব্যবহারের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এতসবের পরও কোনও হেলদোল নেই বহিনজীর।

মসনদে বসা মাত্রই কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে স্ট্যাচু তৈরির ঘটনা মায়াবতীর আমলে আগেও দেখা গেছে। সেদিক থেকে দেখলে দেখা যাচ্ছে, মসনদে বসে তিনি প্রথম কাজ এটাই করেছেন। রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন নিজের মূর্তি। সেই সঙ্গে বি এস পি-র প্রতিষ্ঠাতা কাঁসিরাম ও দলের প্রতীক হাতির স্ট্যাচু। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মায়াবতীর 'মূর্তি ম্যানিয়া' মেনে নিতে পারেননি অনেকেই। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে জনগণের টাকা দিয়ে এই ধরনের কাজ করা নিয়ে। কয়েকদিন আগেই খোদ সুপ্রীম কোর্টও ভর্ৎসনা করেছেন মায়াবতী সরকারের।

১৯৯৫ সলে তিনি প্রথমবার যখন মসনদে বসেন, সেই সময় থেকেই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ণের পরিবর্তে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে পার্ক নির্মাণে হাত লাগান। লক্ষ্ণৌয়ের গৌতমী নগরে ২৫ কোটি টাকা ব্যয় করে দিল্লীর অনুকরণে পার্ক তৈরি করেন সেই সময়েই। ২০০৭ সালে ১৩ মে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে ফিরে এসে রাজ্যজুড়ে নিজের মূর্তি বসানোর দিকে মন দেন। একটার পর একটা মূর্তি বসিয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ দলিতনেত্রী হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। অথচ তিনি একবারও প্রকৃত উন্নয়ণের দিকে নজর দেননি।

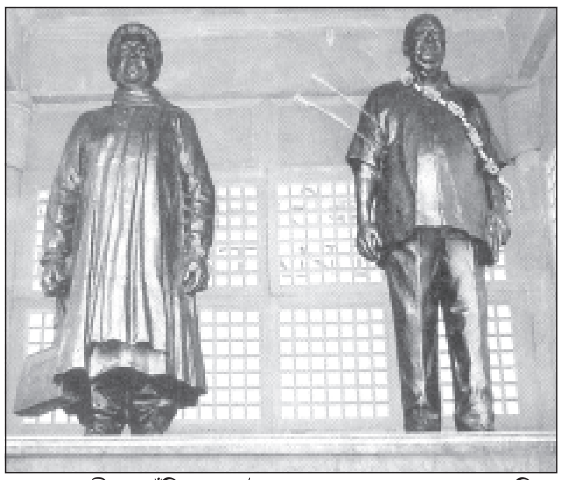

মায়াবতী ও কাঁসিরামের স্ট্যাচু। খরচ হয়েছে ৬.৮৬ কোটি

২০০১-র জনগণনা অনুযায়ী, উত্তরপ্রদেশের মোট জনসংখ্যা ১৬.৬ কোটি। যার মধ্যে দলিত ৩.৫১ কোটি। শতাংশের হিসাবে যা ২১.১ শতাংশ। রাজ্যে ৬৬টি তফসিলি জাতি রয়েছে। দলিতদের মৃত্যুর ঘটনাও তাঁর রাজত্বে সর্বাধিক। এর পরও বহিনজী এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পাননি। রাজ্যের চিত্রকূট, ললিতপুর, মাহোবাস, বঙ্গা প্রভৃতি জেলায় জনজাতিদের অবস্থা মোটেই উন্নত নয়। ২০০৫ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের এক বেঞ্চ তৎকালীন সরকারকে রাস্তাঘাটের উন্নতির দিকে নজর দেওয়ার নির্দেশ দেয়। ট্র্যাফিক ব্যবস্থা থেকে যানজট নিয়ন্ত্রণের একাধিক ত্রুটি তুলে ধরেছিল ওই বেঞ্চ। রাজ্যের এই ত্রুটি দূর করতে মায়াবতী কোনও ব্যবস্থাই নেননি। এত সবের পরেও মায়াবতীর 'স্ট্যাচু ম্যানিয়া' কাটেনি। খোদ রাজ্যের রাজধানীর দিকে তাকালেই অবাক হতে হয়।

শুধুমাত্র লক্ষ্ণৌ শহরেই গড়ে তোলা হয়েছে ৪১৩ একর জমিতে ৫টি বড় বড় পার্ক। যে পার্কগুলিতে বসানো হয়েছে বহিনজীর মূর্তি। সেই সঙ্গে বসপা প্রতিষ্ঠাতা কাঁসিরামের স্ট্যাচুও। এরই মাঝে ইতি-উতি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে হাতির স্ট্যাচু যা দলীয় প্রতীক। ৬০টি হাতির ব্যবহার করা হয়েছে লক্ষ্ণৌ শহরে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে এসব মূর্তির আয়োজন করেছে মায়াবতী সরকার। যা না জনগণের মান বাড়ায়, না রাজ্যের। উপরন্তু এই টাকার মোটা অংশ ব্যয় হয়েছে 'পাবলিক মানি' থেকে। সরকারের কোষাগার হতে। সম্প্রতি মায়াবতীর এই কর্ম-কান্ড নিয়ে সুপ্রীমকোর্টে এক মামলা উঠেছে। 'রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট'-এ আইনজীবী রবি কান্ত এই সমস্ত স্ট্যাচুর পিছনে সাধারণ মানুষের কত টাকা ব্যয় হয়েছে তা জানতে চান। ওই মামলা থেকে জানা গেছে যে সরকার প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় করেছে, যা জনগণের টাকা। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের যোগসাজসে গড়ে তোলা হয়েছে মায়াবতীর স্বপ্নের স্ট্যাচু ও পার্ক। রাজ্য সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের বিভিন্ন শাখা থেকে এই অর্থ খরচ করা হয়। সেই হিসাবে ২০০৮-০৯-এ বিভিন্ন দপ্তর থেকে ১,২০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ২০০৯-১০ সালের জন্য আরও ৬০০ কোটি টাকা এই কাজে ব্যয় করতে চলেছে সরকার। ইতিমধ্যে যা বাজেটে অনুমোদনও পেয়েছে। মায়াবতী অবশ্য এতেই থেমে থাকছেন না। রাজ্য জুড়ে গড়ে তুলছেন একটার পর একটা সরকারি দপ্তর। দপ্তরগুলির পিছনেও ঢালা হচ্ছে কোটি কোটি টাকা।

মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে বিতর্কের জট সম্ভবত উত্তরপ্রদেশেই সর্বাধিক। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আয়ের থেকে বেশি সম্পত্তির মামলাও উঠেছে সর্বোচ্চ আদালতে। জন্মদিনের নামে তাঁর বিলাস-বৈভবও প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায় বহিনজীকে। রাজ্যের সব শিবিরেই প্রশ্ন উঠেছে মুখ্যমন্ত্রী জনগণমুখী না হয়ে, দলমুখী হচ্ছেন কেন। শত বিতর্কের মাঝেও মায়াবতী বদলাননি তাঁর 'মূর্তি ম্যানিয়া'। উল্টে জোর গলায় এসব কাজের পিছনে দলিতদের স্বাভিমানকে জড়িয়ে গর্ব প্রকাশ করেছেন। মায়াবতীর মতে, এসব দলিতদের আদর্শবাদকে তুলে ধরার জন্যই করা। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল সমাজবাদী পার্টির মতে এসবই মায়াবতীর লোক দেখানো। সমাজবাদী পার্টির তরুণ নেতা অখিলেশ যাদবের মতে, 'এসব মায়াবতীর বাতিক, লোক দেখানো'। এখনও পর্যন্ত যা খবর, তাতে মায়াবতী সরকার তার কোনও পদক্ষেপ থেকেই সরে আসেনি। ফলে রাজ্যজুড়ে মূর্তিতে ছয়লাপ করার ঘটনাও থেমে থাকছে না। এক নজরে বহিনজীর বিলাস-বাসনা

✦ আম্বেদকর মেমোরিয়াল, যা আম্বেদকর পার্ক নামে পরিচিত। মায়াবতী সরকার ২০০৩-এ ক্ষমতায় এসে এই কাজে হাত লাগান। ২০০৭-এ আবার ক্ষমতায় ফিরে পার্কের বাকি কাজ শেষ করেন। ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে একাজে।

✦ শহরের জেল রোডের ওপর গড়ে তোলা হয়েছে কাঁসিরামের স্মৃতি সৌধ। এজন্য রাজ্যের ঘাড় ভেঙে খরচ করা হয়েছে ৩৭০ কোটি টাকা। মায়াবতী কাঁসিরামের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে নিজেকে সেরা বসপা নেত্রী হিসাবে তুলে ধরেছেন। উল্লেখ্য, কাঁসিরাম বহুজন সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা।

✦ ২০০৭-এর আগস্ট মাস থেকে কাজ শুরু হয় রমাবাঈ আম্বেদকর র‍্যালি ময়দানের। এটির জন্য ৫১ একর জায়গা কেনা হয়েছে। এটি বিজুনর রোডে গড়ে তোলা হচ্ছে। যার খরচ ৬৫ কোটি টাকা।

✦ ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর সামাজিক পরিবর্তন স্থল (Sthal) গড়ে তোলা হয় ২০০৮-এর এপ্রিল মাসে। রাজ্যের কোষাগার থেকে এর জন্য ব্যয় করা হয় ৭ কোটি টাকা।

✦ ১৮ একর জমির ওপর গড়ে তোলা হয়েছে 'বুদ্ধ শান্তি উদ্যান'। কানপুর রোডের ওপর এটি নির্মিত। এর জন্য খরচ হয়েছে ১৫.১৫ কোটি টাকা। এর কাজ শুরু হয় '০৮-এর এপ্রিল। এখানে বুদ্ধ দেবের মার্বেল স্ট্যাচু বসানো হবে।

✦ ইতিমধ্যেই ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে কাঁসিরাম সাংস্কৃতিক স্থলের জন্য। যা গড়ে তোলা হবে স্মৃতি উপবনে। স্মৃতি উপবন নির্মাণ করা হয়েছিল কারগিলের শহীদদের স্মৃতি রক্ষায়। পাথরের ওপর খোদাই করা কাঁসিরামের মূর্তিবসানো হবে এখানে। সঙ্গে থাকছে বহিনজীর মূর্তিও।

✦ এলাহাবাদের ভি আই পি রোডের ওপর ৬,০০০ বর্গ মিটারে গড়ে তোলা হবে বুদ্ধ স্থল। যার জন্য খরচ হবে ৯০ কোটি। এখানে বসানো হবে বুদ্ধ দেবের তপস্যারত মূর্তি। মাথায় আচ্ছাদন। সেই সঙ্গে সুচতুরভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে হাতির মুখ। হাতি বসপা দলের প্রতীক। ১০০টি থামের মুখ হিসাবে বসানো হচ্ছে হাতির মুখগুলি।

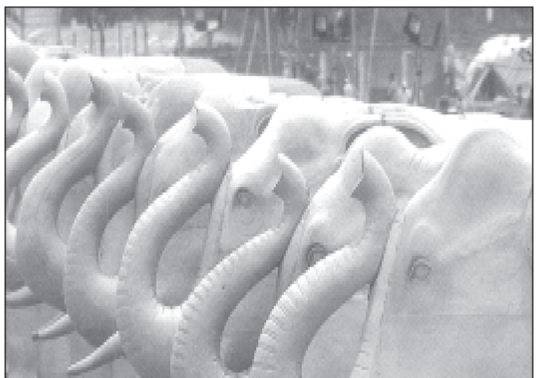

দলীয় প্রতীকের সারি সারি স্ট্যাচু। খরচ হয়েছে ৫২ কোটি টাকা।

নতুন মুখ্যমন্ত্রীতে আশাবাদী উত্তরাখণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি। খান্ডুরির পর উত্তরাখন্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক। রাজ্যের পঞ্চম মুখ্যমন্ত্রী হলেন তিনি। রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁকে মনোনীত করেন রাজ্যের পূর্ববর্তী মুখ্যমন্ত্রী বি সি খান্ডুরি। উত্তরাখণ্ডে দলের ভরাডুবির পর মিডিয়া খবরে রঙ মেশালেও, পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী রূপে নিশাঙ্ককে নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট বুদ্ধি মত্তার পরিচয় রেখেছেন। ২৯ জুন নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের দিন জনগণের উপচে পড়া ভিড় প্রমাণ করেছে রাজ্যবাসীও খুশী খান্ডুরির দেওয়া উপহারে। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভগবৎ সিং কোশিয়ারি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে চাইলেও খান্ডুরি সুকৌশলে তার মোকাবিলা করেছেন। দলও সার্বিকভাবে তা মেনে নিয়েছে। দলের প্রবীণ নেতা এল কে আদবানীও খান্ডুরির সিদ্ধান্তে খুশী। এন ডি এ-র আমলে সড়ক পরিবহনমন্ত্রী হিসাবে খান্ডুরির কাজে প্রসন্ন হয়েছিলেন তিনি।

খাণ্ডুরির সঙ্গে পোখরিয়াল (বাঁ দিকে)।

রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য-রাজনীতিতে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। কবি হিসাবেও তাঁর খ্যাতি আছে। নিশাঙ্কের রাজনৈতিক জীবনের শুরুটা রামমন্দির আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই। ১৯৯১ সালে সরস্বতী শিশু মন্দিরের আচার্য হিসাবে তাঁর পথ চলা। রাজনীতির হাতেখড়ি সাংবাদিকতার জীবন থেকে। ১৯৯১ সালে 'সীমান্ত বার্তা' নামে একটি পত্রিকায় কাজ শুরু করেন। পত্রিকায় সম্পাদকও নির্বাচিত হন তিনি। পত্রিকাটি দেরাদুন থেকে প্রকাশিত হত।

নিশাঙ্ক ১৯৯৩ ও ১৯৯৬ সালে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৯৭ সালে উত্তরপ্রদেশের কল্যাণ সিং-এর আমলে পার্বত্য উন্নয়ণ দপ্তরের মন্ত্রী হন। রাজনাথ সিং-এর ক্যাবিনেটেও (উত্তরপ্রদেশ) নিশাঙ্ক সংস্কৃতি, কলা ও ধর্মসংক্রান্ত দপ্তরের দায়ভার সামলান। উত্তরাখন্ড গঠনের পর নিশাঙ্ক রাজ্যের অন্তর্বর্তী সরকারে প্রথম অর্থমন্ত্রী ছিলেন। ২০০২-এর বিধানসভা নির্বাচনে হেরে তিনি পুনরায় সাংবাদিকতায় ফিরে আসেন। ২০০৭ সালে নিশাঙ্করাজ্যের থালিসান নির্বাচনী ক্ষেত্র থেকে জয়ী হন। খান্ডুরির ক্যাবিনেটে তিনি স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি প্রভৃতি দপ্তরের দায়িত্ব সামলেছেন।

সাহিত্য থেকে রাজনীতি— দুই ক্ষেত্রেই তাঁর অবাধ বিচরণ। ফলে রাজ্যপাট চালাতেও যে তিনি বেশ দক্ষ হবেন, রাজ্যবাসীও এবিষয়ে যথেষ্ট আশাবাদী। এদিকে নিশাঙ্কের নেতৃত্বে দলও উজ্জীবিত হবে এমন আশা করছেন বিজেপির সর্বভারতীয় নেতারাও এবং পরবর্তী ভোটে দলের অবস্থান ভালো হবে বলেই মনে করছেন। স্বামী রামদেবও খুশী হয়েছেন এতে। ৭০ বছর বয়সী খান্ডুরির বুদ্ধি মত্তারও বাহবা দিচ্ছেন অনেকে। দলকে নতুন দিশা দিয়েছেন তিনি। রাজ্যে লোকসভায় বিজেপি একটিও আসন না পেলেও, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে খান্ডুরির সিদ্ধান্তে আশাবাদী রাজ্য-রাজনীতি মহলও।

পরিবেশ ও মানব অধিকার

ডঃ দ্বিজেন গুহবক্সী

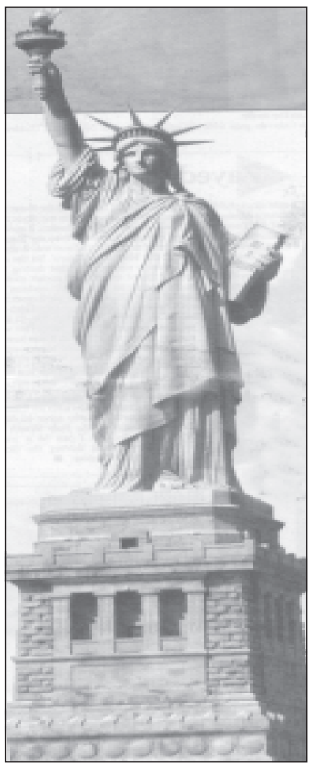

মানুষ ও পরিবেশ সমার্থক। মানুষ পরিবেশের একটি বিশেষ অঙ্গ। সময়ের তালে তালে মানুষ প্রকৃতির উপর নিজের কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মানুষ একটি সামাজিক জীব। তার শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও স্বাভাবিক অনুভূতি দ্বারা তার নিজের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আজকের প্রতিপাদ্য বিষয় হল : মানব অধিকার। গত দুই শতাব্দী হল পৃথিবীজোড়া মানব অধিকারের আন্দোলন চলছে। এর প্রধান প্রধান কারণগুলো হচ্ছে বিশ্ব মহাযুদ্ধের ধবংসলীলা, দুর্বলের উপর বলবানের অত্যাচার, জাতিগত বৈষম্য, দাসত্ব প্রথা, ধর্মান্ধতা প্রভৃতি অন্যতম। এই সব বিভিন্ন কারণে মানুষ নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে। পৃথিবী বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ Haleoml তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'Human Rights in the modern world' -এ দেখিয়েছেন জার্মানীতে হিটলারের সময় নাৎসীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মানব অধিকারের বীজ তখনকার দিনে বপন করা হয়। এই বিষয়ে ১৯৪৩ সালে মস্কো সম্মেলন এবং ১৯৪৪ সালে ডারবারটন ওক্‌মের সম্মেলন বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

জাতিসঙেঘর সনদের ১, ৫৫, ৫৬, ৬২, ৬৮ এবং ৭৬ ধারায় জাতি, বর্ণ, ভাষা, নারী-পুরুষ এবং স্বাধীনতার বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ১৯৪৭ সালে জাতিসঙ্ঘে যে মানব অধিকার কমিশন গঠিত হয় তদানীন্তন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির পত্নী মিসেস ডি রুজভেল্ট প্রথম সভানেত্রী হন।

জাতিসঙ্ঘের তৃতীয় সাধারণ সভায় ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সালে মানব অধিকারের খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর 'মানব অধিকার দিবস' পালিত হয়। ১৯৬৮ সালে আন্তর্জাতিক মানব অধিকার দিবস পালিত হয়।

মূলতঃ মানব কল্যাণের বিভিন্ন দিকে যেমন জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের উন্নতি ও কল্যাণ সাধনের জন্য মানব অধিকারের সূত্রপাত হয়।

অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, বিশেষতঃ নির্যাতিত জেলের অধিবাসীবৃন্দ এই মানব অধিকার কমিশনের কার্যাবলীকে স্বাগত জানিয়েছিল, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি। নিম্নলিখিত কতগুলো বিশেষ উদাহরণ দেখলেই তা বোঝা যাবে যেমন :

(১) জাতি বৈষম্য : বহু দেশে আগের মত চলছে, কোনও হের-ফের হয়নি।

(২) তৃতীয় বিশ্বের শিশুদের অধিকার কার্যত একটি ছল বা তামাশায় পরিণত হয়েছে। তাদের দারিদ্রতার সুযোগে জোর করে তাদের দিয়ে কাজ করানো হয়, এতে অনেক রকম সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

(৩) নির্যাতিত দেশের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এখনও পূর্ণ হয়নি।

(৪) দাস ও দাসত্ব প্রথা যদিও আগের চাইতে কমেছে, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশে এখনও এই প্রথা চালু আছে।

(৫) মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার : যদিও আইনের চোখে পুরুষ ও মহিলা সমান, বিশেষতঃ তাঁদের মর্যাদা, অধিকার, শিক্ষাক্ষেত্রে; কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পুরুষেরা নারীদের উপর বিভিন্নভাবে নির্যাতন করে, মানব অধিকার কমিশন থেকে বহু রকম সতর্কতা ও সাবধান বাণী প্রচার সত্ত্বেও এই অবস্থার খুব একটি পরিবর্তন হয়নি। বিশেষতঃ পণ-প্রথা, ধর্ষণ, নাবালিকা মেয়ের বিয়ে এবং অন্যান্য বহুবিধ ব্যাপারে যেমন বধু নির্য্যাতনে মেয়েদের উপর অমানুষিক ও অমানবিক অত্যাচার করা হয়।

(৬) স্বাভাবিক বিচার : বহুবারই বলা হয়েছে, আইনের চোখে সবাই সমান। কিন্তু এমনও বহু দেশে দেখা যায়, বিনা বিচারে বছরের পর বছর জেলে অনেক সময়ই আটক করা হয়।

(৭) জনস্ফীতি ও স্বল্প শিক্ষা : শিক্ষাই হল সভ্য সমাজের মেরুদন্ড। এখনও অনেক উন্নতিশীল সমাজে দেখা যায়, শিক্ষার হার খুব কম। স্বভাবতই জনস্ফীতি এতে বেড়েই চলেছে। শিক্ষার অভাব ও দারিদ্র্য দেশকে অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এতে সামাজিক ও পরিবেশ দূষণ বেড়েই চলেছে।

ভারতবর্ষে মানব অধিকার রক্ষার জন্য কয়েকটি কার্যক্রম : ১৯৯৩ সালে মানব অধিকার আইন আমাদের দেশে বলবৎ করা হয়। এটি আমাদের মৌলিক অধিকারের আওতায় আনা হয়েছে।

মানব অধিকারের আইনে, ১৯৯৩ সালে নিম্নলিখিত ধারা সংযোজন করা হয়েছে

(১) মানব অধিকার আয়োগ কেন্দ্রে ও রাজ্যে হবে।

(২) এর মধ্যে সন্ত্রাস ও অমানবিক ব্যাপার সম্পর্কীয় ধারা থাকবে।

(৩) জীবনের অধিকার প্রত্যেকেরই থাকবে।

(৪) প্রতিটি লোকেরই স্বাধীনতা থাকবে।

(৫) মেয়েদেরও সমান অধিকার থাকবে।

(৬) অনুন্নত শ্রেণীর লোকেদেরও সমান অধিকার থাকবে।

(৭) প্রত্যেকের আত্মসম্মান সমভাবে থাকবে, ইত্যাদি।

মানব অধিকার আয়োগের নিয়মাবলী বিস্তারিত ভাবে দিলাম না, কিন্তু এই আয়োগের আওতায় কি কি পরে, সে সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রাখলাম।

(১) আয়োগ নিজেদের তথ্যের ভিত্তিতে বা অন্য সূত্র প্রাপ্ত তথ্যের উপর কাজ করবে।

(২) রাজ্য সরকার থেকে অনুমতি নিয়ে জেল বা অন্যান্য জায়গায় পরিদর্শন করে, তাদের বিশেষ নির্দেশ দিতে পারে।

(৩) ভারতীয় সংবিধান ও মানব অধিকার রক্ষার কার্যাবলীর ধারা অনুযায়ী সমস্ত ব্যাপার সংরক্ষণ করা হবে এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করা হবে।

(৪) কোনও অমানবিক কার্য পর্যালোচনা করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে সুপারিশ করা হবে।

(৫) মানব অধিকারের কর্ম যাতে সুসম্পন্ন হয় এবং আরো উন্নত হয়, তার উপর গবেষণা করা হবে।

(৬) মানব অধিকারের বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য কর্মশালা, আলোচনাচক্র, মিডিয়া মারফত যথাসম্ভব প্রচার করা হবে।

(৭) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যাতে মানব অধিকার কার্যক্রম চালু হয় তার দিকে নজর দিতে হবে।

(৮) অন্যান্য কার্যক্রম চালু করা দরকার, যাতে মানব অধিকার কর্মধারা অব্যাহত থাকে।

পরিবেশ ও মানব অধিকার সম্বন্ধে ভিয়েনা ঘোষণাপত্র :

অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে জুন, ১৯৯৩ সালে ১৭১টি দেশের প্রতিনিধি মিলিত হয়ে কতগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় ধারা আলোচনা করেন। এদের মধ্যে স্বাস্থ্য, সাধারণ দূষণমুক্ত আবহাওয়া প্রত্যেক মানুষের জন্য এবং ভবিষ্যতে অনাগত বংশধরেরা যাতে সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারে, তা নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে, চিকিৎসা, যাতায়াত যাতে সুরক্ষিত হয়, সেদিকে সদা সতর্ক থাকতে হবে এবং এইভাবেই মানব অধিকার সুরক্ষিত হবে।

ভারতীয় সংবিধানে পরিবেশ ও মানব অধিকার :

ভারতীয় সংবিধানের ৪৭, ৪৮এ, ২২৬, ৩০০এ, ৩২৫ এবং ৩২৬ নং ধারায় বিশেষভাবে পরিবেশ সংক্রান্ত ও মানব অধিকার সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ আছে।

আমাদের বনসম্পদ :

বনভূমি, জন্মভূমি, ম্যানগ্রোভ বা বাদাবণ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং সুবন্দোবস্ত দ্বারা সহনশীল উন্নয়ণ সম্ভব। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ তিনটি কারণে বিশেষভাবে দরকার —

(১) এতে প্রাকৃতিক ও বাস্তব্য ভারসাম্য রক্ষা করে।

(২) এতে কৌলিক জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে।

(৩) প্রতিটি প্রজাতি সংরক্ষণ করে, তার ব্যবহার করলে বাস্তুতন্ত্র রক্ষা পাবে এবং সহনশীল উন্নয়ণ সম্ভব।

জাতীয়স্তরে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে অনেক আইন-কানুন আছে। কিন্তু সবই তো কাকস্য পরিবেদনা। বিগত ১১ মে, ২০০২ সালে রাজ্য মানব অধিকারের সভাপতি সংসদে বলেছেন মানব অধিকার কমিশন এমন নখদন্তহীন হয়ে পড়ছে। আছে সবই, কিন্তু কার্যকরী করার ক্ষমতা নেই কিছুই ।

দু' বছর আগে কৃষ্ণনগর কলেজের একটি মেয়ে পুতুলরাণী গাছ কাটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রচন্ড প্রহৃত হয়ে বহুদিন হাসপাতালে ছিল। ও একটি ছাত্র ফেডারেশনের সভ্যা ছিল। কোনও দলই এগিয়ে এসে এজন্য প্রতিবাদ করেনি। নামকরা কাগজে প্রতিবাদ পত্র ছাপানো হয় না। এরা সব পরিবেশ প্রেমিক। বড় বড় কথা বলবে, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা, পরিবেশ দিবসে এরা নাচ-গান, বক্তৃতা করে সভাগৃহ কাঁপাবে। 'মরু বিজয়ের কেতন উড়াবে' আর পুকুর বুজিয়ে গাছপালা কেটে পরিবেশ নষ্ট করবে।

আজ পৃথিবী জোড়া চলেছে সন্ত্রাসের রাজত্ব। বিন লাদেন, ওমরকে এখনও ধরতে পারলো না। এত বড় সব যুদ্ধ হয়ে গেল।

বাংলাদেশে ২০০১-এর অক্টোবর মাস থেকে যে অত্যাচার হয়েছে নারীদের উপর, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা হয় না, বাংলাদেশ থেকে (পূর্ববঙ্গ) আগত নেতারা, বুদ্ধিজীবীরা (?) সংস্কৃতির বড় বড় কথা বলেন। আরাফতের উপর প্যালেস্টাইনের আক্রমণ হলে পায়ে পা মিলিয়ে, গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা করেন। বাংলাদেশের নারী নির্যাতন নিয়ে চুপ থাকেন। অথচ এরা এদেরই মা-বোন। যারা নিজেদের মা-বোনেদের ইজ্জত রক্ষা করতে পারে না, ধিক্ তাদের মানব জন্ম। এরাই নন্দনে বক্তৃতা করে লোকজনদের ভাঁওতা দেয়। এতে বিশেষতঃ এ দেশের নারী ভূমিকা নিন্দনীয়।

সর্বশেষে আমি গুজরাটের পরিস্থিতি নিয়ে বলছি। এটি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে একটি কালিমালিপ্ত অধ্যায়। যত তাড়াতাড়ি এটি বন্ধ হবে ততই মঙ্গল। কোনও স্বচ্ছ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন লোকই এইসব দাঙ্গা হাঙ্গামা সমর্থন করে না।

এতে দেশেরও বদনাম এবং লোকজনেরও দুর্দশার অন্ত থাকে না। বলিষ্ঠ ও সুস্থ মানসিকতাই এই ধরনের দাঙ্গা -হাঙ্গামা বন্ধ করতে পারে। সব ব্যাপারেই হৃদয়বৃত্তিকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে।

নিরুপম অ্যাণ্ড কোম্পানী

(৫ পাতার পর)

এঁরা হলেন দেবাশিস সেন, সুমন্ত্র চৌধুরী (সুভাষ চক্রবর্তীর পছন্দের লোক), সব্যসাচী সেন (ইনি বুদ্ধবাবু ও নিরুপমবাবুর কাছের লোক (?) বলে পরিচিত), এম এল মীনা — এঁদের দিল্লীতে যাবার দরবারের খবর তো দৈনিকে প্রচারিত। প্রচারিত নয় এমন আরও ৭-৮ জন আই এ এস তৃণমূল শিবির আশ্রিত। এই আই এ এস-গণ "সুশীল"-এর উদ্যোক্তা শুভাপ্রসন্ন-এর মাধ্যমে মমতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন বলে শোনা যাচ্ছে। সব থেকে আশ্চর্যজনক সংবাদ হল, আলিমুদ্দিন-এর ব্লু আইড কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-এর প্রশাসক আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ও শুভাপ্রসন্ন মারফৎ মমতা-এর কাছে যাবার প্রয়াসে লিপ্ত?

এদিকে পার্টির মধ্যে জেলাস্তর পর্যন্ত বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম-শ্যামল — এই "দুষ্ট" চতুষ্টয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। একদিন বিস্ফোরণ ঘটবে। মন্ত্রী আবদুর রেজ্জাকের মতে বিধানসভা নির্বাচনের আগেই রাজ্যের সিপিএম-এ ভাঙ্ন দেখা দিতে পারে — তবে সেটা তৃণমূল ঘেঁষা হবে। রাজ্যের নানা দুর্নীতি নাকি তৃণমূলের সাতজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তদন্ত করবেন। এই কলামে দাবী করছি যে "জাল কিট"-এর বিষয়টি যেন দীনেশবাবু তদন্ত করেন। না করলে বুঝতে হবে কোনও রহস্য আছে।

মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী সর্বদাই বাণী দেন। তাঁর বাচালতা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সুভাষবাবু বলেছেন — বাড়ির পরিচারিকারা মাসে পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করেন এবং পার্ক স্ট্রিটের ভিক্ষুকগণ দৈনিক হাজার টাকা আয় করেন।

কলকাতার মেয়র রাজ্য সরকার-এর বন বিভাগের মামলায় আইনজীবী হিসাবে এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন। তিনি বলেছেন এটাই তার ফি।

রাজ্যের জনৈক মন্ত্রী হাজার হাজার টাকার চশমার বিল দিয়েছেন। এর আগে জনৈক মন্ত্রী তাঁর স্ত্রী রোজগার করা সত্ত্বেও বেকার দেখিয়ে স্ত্রীর চশমার জন্যে হাজার হাজার টাকার বিল করেছিলেন। একজন মন্ত্রী নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে অসত্য তথ্য দিয়েছেন। এঁরা আবার নিজেদের গরীবের বন্ধু বলে দাবী করেন — ধিক্, ধিক্।

নতুন তথ্য নতুন আঙ্গিকে

গ্লোবাল ওয়ার্মিং ঃ বাতাসে বিষের গন্ধ

অর্ণব নাগ

> “বিদেশের বাজার ধরার তাগিদ আর উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়নের যাবতীয় সুফল নিজেদের কুক্ষিগত করার এক দুরূহ প্রয়াসে জি-৮-এর বদান্যতায় বিশ্বকে একটিমাত্র গ্রামে পরিণত করবার প্রচেষ্টা পৃথিবীকে আরেকটি নতুন সমস্যার মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, যার পোষাকী নাম ‘গ্লোবাল ওয়ার্মিং’ বা বিশ্ব উষ্ণায়ণ।”

প্রসোপিস জুলিফ্লোরা

সাত সমুদ্র আর তেরো নদী পেরোনো পৃথিবীর দিন নাকি শেষ, আন্তর্জাতিক বিশ্ব এখন ‘গ্লোবাল ভিলেজ’-এ পরিণত। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই কথাটা বলা চলে এখন প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে। গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ণ-এর সুফল-কুফল নিয়ে বহুবার তর্ক-বিতর্কের তুফান উঠেছে চায়ের পেয়ালায়। তবে গত বছর লেম্যান ব্রাদার্সের দেউলিয়া ঘোষণা এবং এর অব্যবহিত পরে বিশ্ব জুড়ে আর্থিক সংকট, যা এখনও চলছে, তা বিশ্বায়ণের প্রয়োজনীয়তাকেই আজকের দিনে এক বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। আসলে জি-৮-এর দেশগুলি অর্থাৎ ইংল্যান্ড, কানাডা ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, জাপান, রাশিয়া এবং আমেরিকার স্বার্থেই নিরূপিত হয়েছিল বিশ্বায়ণের সংজ্ঞা। বিদেশের বাজার ধরার তাগিদ আর উন্নয়ণশীল দেশগুলির উন্নয়ণের যাবতীয় সুফল নিজেদের কুক্ষিগত করার এক দুরূহ প্রয়াসে জি-৮-এর বদান্যতায় বিশ্বকে একটিমাত্র গ্রামে পরিণত করবার প্রচেষ্টা পৃথিবীকে আরেকটি নতুন সমস্যার মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যার পোষাকী নাম ‘গ্লোবাল ওয়ার্মিং’ বা বিশ্ব উষ্ণায়ণ। একে এক কথায় বোঝানো খুব কঠিন ব্যাপার। তবু বলা যেতে পারে, পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ছে। এই উষ্ণতা বৃদ্ধি র প্রভাব উষ্ণতা সূচক (সেন্টিগ্রেড বা ফারেনহাইট)-এর গন্ডীতেই সীমাবদ্ধ নেই। এর প্রভাবে পাল্টে যাচ্ছে পৃথিবীর জলবায়ু, জীববৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নানান জটিলতা। জীব বৈচিত্র্যের অতুল সম্পদের অধিকারী আমাদের ভারতবর্ষের ‘বায়োডাইভার্সিটি’ও আজ বিপন্ন বহিরাগত বিদেশী প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর আক্রমণে। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে - Economics (অর্থনীতি)-এর বিশ্বায়ণ থাবা বসিয়েছে Ecology (বাস্তুতন্ত্র)-এর বিশ্বায়ণে।

পৃথিবীর অস্বাভাবিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি কেন হচ্ছে এনিয়ে খতিয়ে দেখার জন্য ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে গঠিত হয় ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আই পি সি সি)। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জিনারো এবং ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োটা শহরে সম্মেলন করে তাঁরা বিশ্ব উষ্ণায়ণ রোধে একগুচ্ছ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ২০০৭ সাল নাগাদ আই পি সি সি যে চতুর্থ পর্যালোচনা রিপোর্ট পেশ করে তাতে দেখা যায়, গত একশ বছরে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ক্রমশ ০.৭৪ ডিগ্রি বেড়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ১৯৯৫ থেকে ২০০৬। এই বারো বছরে গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি হয়েছে সবচেয়ে বেশি এবং এর মধ্যে এগারো বছরই ছিল বিশ্বের ইতিহাসে উষ্ণতম বছর। এই উষ্ণতার আঁচ বিশ্বজুড়ে প্রতীয়মান হলেও ভারতবর্ষে সেই উত্তপ্ত অবস্থার প্রভাব একটু বেশিই পড়বে — এটা স্বাভাবিক। কারণটা বলার আগে দেখে নেওয়া যাক আমাদের জীববৈচিত্র্যের খতিয়ানটা। প্রথমেই বলে রাখা দরকার, পরিবেশ-জীব বিজ্ঞানের দৌলতে বিশ্বের যে বারোটি দেশকে ‘মেগা জিন সেন্টারের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ভারত তার মধ্যে অন্যতম। বিশ্বের সর্বমোট ৩১টি বায়োলজিক্যাল হটস্পটে’র মধ্যে দুটি হটস্পট এদেশেই অবস্থিত। হটস্পট বলতে এমন অঞ্চ ল বোঝায়, যে অঞ্চ ল জুড়ে শুধুই জীববৈচিত্র্যের সমারোহ দেখা যায়। ভারতবর্ষে এরকম দুটি হটস্পট হল উত্তর-পূর্ব হিমালয় এবং পশ্চি মঘাট পর্বতমালা। পৃথিবীতে যতগুলি প্রজাতি (উদ্ভিদ ও প্রাণী) রয়েছে তার মধ্যে আট শতাংশেরও বেশি প্রজাতি রয়েছে ভারতে, যদিও পৃথিবীর মোট আয়তনের মাত্র ২.৪ শতাংশ স্থান জুড়ে তারা অবস্থান করছে এদেশে। এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত প্রজাতিগুলি টিকে রয়েছে সেই হিসেব ধরলে ভারতে প্রাণী প্রজাতি রয়েছে প্রায় ৯১,০০০ এবং উদ্ভিদ প্রজাতি রয়েছে ৪৫,৫০০। এছাড়াও ক্ষুদ্র অনুজীবের সংখ্যা এদেশে ৫,৬৫০। এই সমগ্র প্রজাতিগুলিই রয়েছে ভারতের দশটি জৈব-ভৌগোলিক স্থানে। এই প্রজাতিগুলির মধ্যে সবগুলিরই উৎপত্তি স্থল যে ভারত, এমন কিন্তু নয়। এখনও অবধি যা পরিসংখ্যান মিলছে তাতে দেখা যাচ্ছে, এদের মধ্যে চল্লিশ শতাংশই বৈদেশিক উৎপত্তিগত। আবার এই ‘ফরেন অরিজিন’-দের মধ্যে পঁচিশ শতাংশ কোনও না কোনও ভাবে আক্রমণ করছে ভারতীয় প্রজাতিগুলিকে। এর কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতেই পারে। ১৮৪০ সাল নাগাদ শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের শোভাবর্ধন করার জন্য ইউপাটোরিয়াম প্রজাতির পাতাবাহারী গাছ লাগানো হয়। এই প্রজাতির বৈশিষ্ট্য হল এরা দ্রুত বীজ উৎপাদন করে এবং এদের ডালপালা খুব দ্রুত ছড়িয়ে গিয়ে ঘন জঙ্গল নিমেষে তৈরি করে ফেলে। সুতরাং যা হবার তাই হয়েছে। এই প্রজাতির গাছে ভরে গিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। এবং এদের তৈরি জঙ্গলের কারণে চা, কফি, আম, রবার চাষ প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফালারি’স মাইনর প্রজাতির একশ্রেণীর আগাছার আক্রমণে এদেশে গমের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই প্রজাতিটিও বিদেশ থেকে আগত এবং এর দরুণ প্রায় বার্ষিক ২০,০০০ কোটি টাকা ক্ষতির মুখে পড়ছে আমাদের দেশ। গত শতাব্দীতে আমাদের দেশে প্রসোপিস জুলিফ্লোরা নামক একটি বিদেশী প্রজাতিকে ভারতে আমদানী করা হয়েছিল ভূমিক্ষয় রোধ করার জন্য। সময় গড়াতে দেখা গেল এটি একটি ক্ষতিকারক প্রজাতি। আরও দুঃখের বিষয়, ওই প্রজাতিটি যে কোনও ইকোসিস্টেমেই, তা সে সমুদ্রের উপকূলই হোক বা মরুভূমিই হোক, চমৎকারভাবে বাড়তে পারে। এই বৃদ্ধি ক্রমশ ঘন জঙ্গলের জন্ম দেয় এবং সংলগ্ন যাবতীয় স্থানে অন্যান্য প্রজাতিগুলিকে উৎখাত করে। পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে ১৯৫২ সাল নাগাদ ছাড়া হয় লায়লনটিকা প্রজাতির মাছ। পরবর্তীকালে যার ভারতীয় সংস্করণের নাম হয় তেলাপিয়া। বলা বাহুল্য, তেলাপিয়া সমৃদ্ধ বাস্তুতন্ত্রে জু-প্ল্যাংটন, ফাইটো-প্ল্যাংটন সহ অন্যান্য উপাদানগুলির অস্তিত্বই সঙ্কটের মুখে পড়ে। যে কারণে এই প্রজাতিটি নববইটিরও বেশি দেশে আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই তথ্যগুলির সঙ্গে আরও একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য সংযোজন করা দরকার যাতে বিশ্ব উষ্ণায়ণের ভারতীয় কু-প্রভাব সম্পর্কে ধারণাটা স্পষ্ট হবে। ১৮৪৫-৪৭ সাল নাগাদ আয়ারল্যান্ডে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষের এক এবং একমাত্র কারণ ছিল আলুর ধসা রোগ। এর কারণ ছিল ওই সময় আয়ারল্যান্ড এবং পার্শ্ববর্তী বিরাট অঞ্চ লের উষ্ণতা আচমকাই বেড়ে গিয়েছিল। ধসা রোগের ‘কমন ভাইরাস’ ফাইটোপথোরা ইনফেসট্যান্সের বৃদ্ধি সবচেয়ে ভালো হয় বেশি উষ্ণতায়। গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে যেটা হয় তা হল শীতে তেমন ঠান্ডা পড়ে না, মাঝে মাঝেই আকাশ মেঘলা থাকে, আবার গরমের সময় কথা নেই, বার্তা নেই, মাঝে মধ্যেই ঝুপঝুপ করে দু’এক পশলা বৃষ্টি হয়, শীতের শেষে ভোরের দিকে ঘন কুয়াশা — এসবই ডেকে আনে ধসা রোগকে। এই মুহূর্তে দেশে এই যে আলুর আকাল তার একটা বড় কারণ কিন্তু ওই ধসা রোগ। বিশ্ব উষ্ণায়ণের প্রভাব শুধু ধসা রোগেই সীমিত নেই, একটু আগেই যে বৈদেশিক প্রজাতিগুলির আক্রমণের কথা বলেছি তার একটা বড় কারণ কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়ণ। বিজ্ঞানের ভাষায় ওই বিদেশী প্রজাতিগুলিকে বলা হয় ‘হার্ডি স্পিসিজ’। অর্থাৎ সার, বা ঠিকঠাক মতো জল-টল না পেলেও যারা অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে — সহজে নির্বংশ হবার সম্ভাবনা নেই। বিশ্ব উষ্ণায়ণের প্রভাবে আবহাওয়ার খামখেয়ালীপনায় ওই প্রজাতিগুলির দ্রুত বৃদ্ধি হয়, পক্ষান্তরে ভারতীয় প্রজাতিগুলি ‘সুখী’ টাইপের। বিশ্ব উষ্ণায়ণের প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কা সামলাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে তাদের। ডারউইনের ‘যোগ্যতমের উদবর্তন’ (Survival of the fittest) নীতি অনুসরণ করে তাই অবলুপ্তি ঘটছে ভারতীয় প্রজাতিগুলির।

এই বিশ্ব উষ্ণায়ণের প্রভাবে যেভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে, এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছে সদ্য সমাপ্ত জি-৮-এর সম্মেলন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা ওখানে কায়দা করে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন জি-৮-এর দেশগুলির সঙ্গে বিশ্বের বাকি দেশগুলোকেও বিশ্ব উষ্ণায়ণ রোধে সচেষ্ট হতে হবে। বিশ্ব উষ্ণায়ণের একটা বড় কারণ গ্রীন হাউস গ্যাস, অর্থাৎ কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি সূর্যের আলোকরশ্মি শোষণের পর উদ্ভিদ ও মাটি থেকে সেই তাপের বিকিরণ হয়। ফলে পরিবেশের পরিমন্ডল উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

উন্নয়ণশীল এবং উন্নত দেশগুলিতে শিল্পায়ণের ফলে কার্বন জাতীয় যৌগের প্রভূত ব্যবহার হয়। এছাড়া, সেতু, সড়ক ইত্যাদি তৈরির জন্য গাছ কাটার ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। এর ফলে একদিকে যেমন বিশ্ব উষ্ণায়ণের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, তেমনি অ্যাজমা (এক ধরনের শ্বাসকষ্ট)-র সৃষ্টি হচ্ছে। আপনার অ্যাজমা থাকুক আর নাই থাকুক ইদানীং প্রচন্ড গরমে দুপুরবেলা একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখবেন। আগে গরমের দুপুরে প্রচন্ড ঘাম হোত, জলতেষ্টা পেত। ইদানীং কালে দেখবেন ঘাম হচ্ছেনা, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন, বাতাসে বিষের গন্ধ। সূর্যরশ্মিতে উত্তপ্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড কমিয়ে দেয় বাতাসের আদ্রতাও। যার ফলে ডি-হাইড্রেশন অনিবার্য। যা কখনও কখনও মানুষকে মৃত্যুমুখেও ঠেলে দেয়। আই পি সি সি-র রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০৫ সাল নাগাদ বায়ুমন্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ৩৭৯ পি পি এম (দশ লক্ষ প্রতি)। যার স্বাভাবিক পরিমাণ থাকার কথা ১৮০ থেকে ৩০০-র মধ্যে। কিছুদিন আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় রবিবাসরীয়তে পথিক গুহ লিখেছেন, এই মুহূর্তে মহাকাশে সাত লক্ষ আবর্জনার টুকরো ঘুরপাক খাচ্ছে। ওই অসাধারণ লেখনীতে শ্রী গুহ দেখিয়েছেন, আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের বিভিন্ন সময়ে মহাকাশে পাঠানো কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ কোনও কারণে সংঘর্ষে ভেঙ্গে গিয়ে ওই আবর্জনার সৃষ্টি করেছে। সুতরাং ওবামা সাহেবের দায় এড়াবার কোনও উপায় নেই। বিশ্ব উষ্ণায়ণের দায়ভার তাই বর্তাচ্ছে উন্নয়নপথযাত্রী প্রত্যেকটি দেশের কাঁধে। ওবামা দাওয়াই দিয়েছেন, কার্বন জাতীয় যৌগের ব্যবহার কমাতে হবে। খুব ভাল কথা! কিন্তু উন্নয়ণশীল দেশগুলিতে যদি আচমকা কার্বনের ব্যবহার কমিয়ে দেওয়া হয়, তবে তো তাদের উন্নয়ণই থমকে যাবে। এর দায়িত্ব কি ওবামা নেবেন? তাই মোক্ষম দাওয়াইটা দিয়েছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব বান কি মুন। তিনি বলেছেন “কার্বন জাতীয় যৌগের ব্যবহার কমাতে জি-৮ দেশগুলির উচিত উন্নয়ণশীল দেশগুলিকে আর্থিক সহায়তা করা।”

বিশ্ব উষ্ণায়ণ ডেকে আনে সুনামী বা আয়লার মতো প্রাকৃতিক তান্ডব। বিশ্ব উষ্ণায়ণে সমুদ্রের জলস্ফীতি হয়। যার দরুণ অচিরেই আরব সাগরের গর্ভে তলিয়ে যেতে পারে মুম্বাই মহানগরী। বরফ গলছে সাইবেরিয়ায়। আল্পস পর্বতমালারও একই অবস্থা।

এমনিতেই তো পৃথিবীর একভাগ স্থল, তিনভাগ জল। সুতরাং আগামীদিনে প্লাবন অনিবার্য। কার্বনকে দূরে সরিয়ে রেখে সৌরশক্তির ব্যবহার হয়ত কিছুটা কমাবে উষ্ণায়ণকে। কিন্তু ‘গ্লোবাল ওয়ার্মিং’-এর দাপটে পাল্টে যাওয়া জলবায়ু (Climate)-এর সংজ্ঞাকে (Definition) পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা কি সৌরশক্তির আছে? বাতাসে বিষ ঢালবার সুখে এর উত্তর খুঁজবে ভবিষ্যৎ।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর পয়লা নম্বর ভিলেন কলকারখানা থেকে নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইডের ধোঁয়া।

পশ্চিমবঙ্গের ‘গর্বাচভ’

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ভ্রান্ত শিল্প নীতির ফলে এ রাজ্যে শিল্পোন্নয়ন বিশেষত আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রসার তো ঘটেইনি, বরং যেসব শিল্প সুনামের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল তারাও পড়তে থাকে মুখ থুবড়ে।

কিন্তু ফ্রন্টের কৃষিনীতি বামফ্রন্টকে দাঁড় করিয়ে রাখে দৃঢ় ভিত্তির উপর। বামফ্রন্টের ভূমি সংস্কার, কৃষি আন্দোলন ও কৃষি জমির সুরক্ষা কৃষিজীবী মানুষদের বামবিরোধী হতে দেয়নি। শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বাম সরকারের ভ্রান্তনীতির বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও জোরদার সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। তাছাড়া জ্যোতিবাবুও ছিলেন কৃষি জমিতে শিল্প গড়ার বিরুদ্ধে। অথচ ২০০৯ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বাম সরকারের নেতৃত্বে এসেই জ্যোতিবাবুর অনুসৃত কৃষি নীতির বিরোধিতা করে তাঁর উল্টোপথে চলতে শুরু করেন। তাই একদা যে কৃষক আন্দোলন ছিল জ্যোতিবাবুদের ক্ষমতা দখলের প্রাণভোমরা, তাকে বুদ্ধবাবু হত্যা করে এরাজ্যে শিল্পের জোয়ার বইয়ে দিতে কৃষি জমিতে শিল্প-কারখানা স্থাপনে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন এবং একাজে এরাজ্যে ডেকে আনেন এককালের শত্রু এবং বর্তমানের বন্ধু দেশি পুঁজিপতি ও শিল্পপতি টাটা এবং বিদেশি শিল্পপতি সালিম-সান্তোষাদের। কৃষকদের জমি কেড়ে নিয়ে সেই জমি তিনি উপঢৌকন দেন টাটা, সালিম-সান্তোষাদের ন্যায় দেশি-বিদেশি শিল্পপতিদের শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। সিঙ্গুরের শতশত একর কৃষিজমির দখল নেয় টাটা গোষ্ঠী। আর নন্দীগ্রামে ‘কেমিক্যাল হাব’ গড়ে তুলতে ডাক পড়ে সালিমগোষ্ঠীর। কিন্তু সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের মানুষ বুদ্ধবাবুর এই অপকর্মের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। অবশ্য তাঁদের ঠান্ডা করতে তাঁর নির্দেশে পুলিশ ও সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী যৌথভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁদের উপর। চলে নির্বিচারে গুলি। হতাহত হন অজস্র নিরস্ত্র ও নিরপরাধ মানুষ। সিঙ্গুরে তাপসী মালিক হয় ক্যাডারদের ধর্ষণের শিকার। তাকে হত্যা করা হয় আগুনে পুড়িয়ে। কিন্তু সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের গণহত্যা ও কৃষিজমি কেড়ে নেওয়ার পাপ বুদ্ধ সরকারের ভিত নাড়িয়ে দেয়। সূচনা করে তার অন্তর্জলি যাত্রার। পরবর্তী উপনির্বাচন, লোকসভা ও পুরসভার নির্বাচনে বামফ্রন্টের ভরাডুবি তারই প্রমাণ। আর এই ভরাডুবির দায় স্বীকার করে বুদ্ধবাবুর উচিত নেতৃত্ব থেকে সরে যাওয়া।

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে কমিউনিজম মুছে যাওয়ার জন্য যদি মিখাইল গর্বাচভকে দায়ী করা হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কমিউনিজমের বিদায় নেওয়ার জন্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও সমানভাবে দায়ী। তাই বুদ্ধবাবুকে পশ্চিমবঙ্গের ‘গর্বাচভ’ বললে অত্যুক্তি হবে কী? তবে নিয়তির পরিহাস, নবতিপর জ্যোতি বসুকে এবঙ্গের কমিউনিজমের বিদায় চাক্ষুষ করতে হচ্ছে বুদ্ধবাবুর ব্যর্থতায়।

ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

অপকর্মের ফল

দীর্ঘ ৩২ বছরের বাম জমানায় অপকর্মের ফল আজ বিভিন্ন জেলায় ঘটে চলেছে। লালগড়, খেজুরিসহ বিভিন্ন জায়গায় গরীব সাধারণ মানুষ আজ নেতা-নিধন যজ্ঞে সামিল হয়েছেন। তাদের মূল লক্ষ্য আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত সেইসব নেতা যারা দিনের পর দিন এইসব জায়গায় হিটলারি শাসন চালিয়ে গেছেন। পার্টির জুজু দেখিয়ে সাধারণ মানুষের মুখ বন্ধ রাখতে বাধ্য করেছেন। যেখানে সাধারণ মানুষ ক্ষুধার্ত, মানুষ পেটের জ্বালায় অন্ন না পেয়ে পিঁপড়ের ডিম খেতে বাধ্য হচ্ছে, সেখানে একজন পার্টির সাধারণ হোলটাইমারের বিত্তের পাহাড়ে বসে থাকার রহস্যের হিসাব চাইছে আমজনতা। আর সেইসব করে-কম্মে খাওয়া পার্টির হোলটাইমারেরা আজ লুকিয়ে পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। নতুবা বেঘোরে প্রাণ দিতেও বাধ্য হচ্ছেন। একথা ঠিক, যে কোনও মৃত্যুই মর্মান্তিক। কিন্তু কারণ খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এই পরিস্থিতি একদিনে তৈরি হয়নি। সি পি এম জমানার দীর্ঘ দুর্নীতির বিষবৃক্ষের ফল আজ ফলতে শুরু করেছে। যেখানে প্রশাসন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে। দুর্বল পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিতে গেলে তাদের সামাজিক বয়কটের মুখে পড়তে হচ্ছে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে, রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক অপদার্থতা। এই রাজ্যে নির্বাচিত কোনও সরকার আছে বলে মালুম হচ্ছে না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীসহ অলিমুদ্দিনের নেতারা মুখ লুকোতে পারছেন না।

সুশান্ত কুমার দে, গ্রিন পার্ক, কলকাতা।

হায় বাংলা

গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহের মাঝেই পঞ্চদশ ভোটদাহে ক্লান্ত বঙ্গবাসী। ওই বঙ্গ ও এই বঙ্গে জনরায়ে পরিবর্তন সূচিত। ওপার বাংলার বর্তমান সরকার সংখ্যালঘু অধিকার সুরক্ষায় কতকটা হলেও যত্নশীল হয়ে উঠেছে। যদিও নবগঠিত সরকার ইতিমধ্যেই ধর্মীয় মৌলবাদী তালিবানী বিষ ছোবলের স্বাদ পেয়ে আশু চ্যালেঞ্জকে উপলব্ধি করতে পেরেছে বলে মনে হয়। সেইজন্য সৎ-সদিচ্ছার কাছে অশুভ শক্তির পরাজয় ঘটবেই একদিন মনে হয়। সম্প্রতি যে কটি বিষয়ে সরকার পদক্ষেপ নিতে চলেছে তা অপ্রশংসনীয় নিঃসন্দেহে। এর একটি চট্টগ্রাম অস্ত্রকান্ডের দোষীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু ও অপরটি অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন (২০০১) কার্যকরী না করার প্রক্রিয়া, আর শেষটি রাজাকার যুদ্ধ-অপরাধীদের বিচারের বেড়াজালে আনার চেষ্টা। এই ক'টি বিষয়কে কেন্দ্র করে দেশটার একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে আশা করা যায় এবং তবেই সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দুরা অন্তত্তপক্ষে সুরক্ষিত থাকবে বলেই মনে হয় — এই গেল ওপার বাংলার কথা।

আর আমার এপার বাংলা। এখানে সরকারি ও বেসরকারি রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে এক নব্য মৌলবাদের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে ধীরে ধীরে। বাংলার গ্রাম-প্রান্তরে তাকালেই একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আর এই মানসিকতার পরিবর্তনই ঈশানে অশনি হচ্ছে না তো? নির্বাচনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে রাজ্যের সংখ্যালঘুরা শাসক সি পি এমের পাশ থেকে সরে গিয়েছে। সেইজন্য একটা প্রতিযোগিতা তৈরি হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য। সমস্ত দলই স্পষ্টভাবে বুঝে গিয়েছে সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ককে পেতে গেলে চরমভাবে তোষণ করতে হবে অর্থাৎ এক কথায় পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতির পথেই হাঁটতে হবে। আর এই নীরব প্রতিযোগিতাই বাংলায় কোনও এক ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদের কালো মেঘ জমচ্ছে। প্রগতিশীলতার নামাবলী গায়ে চড়িয়ে কিছু নেতৃবৃন্দ পরিণাম না ভেবে একেবারে ‘দাতা কর্ণের’ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এমনিতেই কয়েকটি জেলায় জনবিন্যাসের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুরা নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন ক্রমে গ্রামগুলি হিন্দু শূন্য হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। ফলত বাংলার রাজনীতি, দেশভাগ পূর্ব অবস্থার দিকে এগোচ্ছে না কি? সেই সময় এপার বাংলায় রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে থেকে সরকার দাঙ্গা সংগঠিত (১৯৪৬ এর ১৬ আগস্ট) করে হাতেখড়ি দিয়ে ওপার বাংলায় সংখ্যাগুরু হয়ে সংখ্যালঘু নিধন সম্পন্ন করে নোয়াখালীসহ বিস্তীর্ণ বাংলার প্রান্তরে। সেই সময় কংগ্রেস, বামপন্থীরা যেরকম নীরব সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল আজও কি তারা তা নিচ্ছে না? উদারচেতা ও সনাতনপন্থী হিন্দুদের সহনশীলতাকে কি ‘ব্লাকমেল করা হচ্ছে না? আজ একথা বলার প্রয়োজন হত না, যদি বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভারতীয় বোধে উদ্বুদ্ধ না করে কেবল ‘সংখ্যালঘু’ নামক আলাদা অস্তিত্বের পরিচয়ের মধ্যে আটকে রেখে নিজ দেশকে ‘পরদেশ’ ভাবার মানসিকতা তৈরি করে দিত। আর ধর্মীয় মৌলবাদের বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে তারা অনেকটাই ‘গুছানো’ অবস্থায়। তাই দু'বাংলার আজ একপ্রান্তে যখন মৌলবাদের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা চলছে, ঠিক তখনই এই প্রান্তে রাজনীতির প্রশ্রয়ে ও রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বাদ পেতে সেই মৌলবাদকেই পরোক্ষে আহ্বান করা হচ্ছে।

শিবাশীষ রায়চৌধুরী, ধুবুলিয়া, নদীয়া

সোমনাথের উপদেশ

লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় নতুন স্পিকার মীরাকুমারকে এই বলে পরামর্শ দিয়েছেন যে, তিনি যেন সোমনাথবাবুর পথ অনুসরণ করে ‘দলত্যাগ’ করেন, যাতে স্পিকার পদে থেকে দলীয় বিতর্কগুলিকে এড়ানো যায় — (‘এই সময়’ - স্বস্তিকা, ২২।৬।০৯)। কিন্তু ঘটনা হল, স্পিকার পদে থাকাকালে সোমনাথবাবু কখনই দলত্যাগ করেননি। পরমাণু চুক্তি নিয়ে দলের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থানের দরুণ তিনি দল থেকে বহিস্কৃত হয়েছেন। তার আগে পর্যন্ত সাড়ে চার বৎসরকাল সোমনাথবাবু যুগপৎ লোকসভার স্পিকার এবং দলীয় সদস্যপদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।

বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৬০

হাসপাতাল নয়, নরক

গত ২৯ জুন ‘স্বস্তিকা’ পত্রিকার নয় পাতায় প্রকাশিত সংবাদে দেখলাম, রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে, “হাসপাতাল তো নয় যেন নরক” শীর্ষক সংবাদ। এটা পড়ে কেউ-ই বিস্মিত ও আশঙ্কিত হবে না। কারণ ৩২ বছরে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প সব কিছুই ধ্বংস করে ফেলেছে। পত্রিকা, টিভির পর্দায় সব কিছু দেখে রাজ্যের সাধারণ মানুষের এ সরকারের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। গত ১৫ জুন ২০০৯ একটি দৈনিকের ৫ পাতায় প্রকাশিত সংবাদে দেখলাম, রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী। দীনেশবাবু গত ১৪ জুন কলকাতায় চিকিৎসকদের এক সম্মেলনে বলেছিলেন “এ রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলি এক-একটি চিড়িয়াখানা। কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, আরশোলা কি না ঘোরাফেরা করে সেখানে!” সমালোচনার পাশাপাশি দীনেশবাবু এদিন বুঝিয়ে দেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল ফেরাতে মন্ত্রী হিসাবে যথাসাধ্য করবেন তিনি। সেইমতো পশ্চিমবঙ্গের সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে তিনি বেশ কিছু রিপোর্ট সংগ্রহ করেছেন।

কেন্দ্রের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী মহাশয়কে বলতে চাই, আমরা লক্ষ্য করেছি, কেন্দ্র কি রাজ্যের অনেক মন্ত্রীই ডাক্তারদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব পরিবর্তনের কথা বলেন বটে, কিন্তু ওখানেই শেষ! কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে কড়া হাতে মোকাবিলা না করলে কোনও কিছুই হতে পারে না। খোদ সরকারই যদি কার্যত অসহায় হয়, তাহলে তো সাধারণ মানুষ দুর্ভোগের কবলেই পড়তে থাকবে। কোনও সুবিচারই পাবে না। পশ্চিমবঙ্গের কেবল স্বাস্থ্য পরিষেবা, ডাক্তারদের ওপর বিশ্বাস হারানো এবং বাড়ির পাশের হাসপাতালটি সম্পর্কে এমন ধারণা বদ্ধমূল বলেই দক্ষিণের বিভিন্ন শহরে চিকিৎসার জন্য ছুটছে দলে দলে মানুষ। ফিরে এসে আবার তাঁরাই বলছেন, দক্ষিণের হাসপাতাল এঁদের টানছে ডাক্তার, নার্স, সর্বোপরি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ব্যবহার এবং চিকিৎসা ব্যবস্থায়। রোগ সারুক, না সারুক, ঠকে যাওয়ার আশঙ্কা বলতে গেলে নেই। সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোমে গিয়েও কী ধরনের নির্মম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তা অনেকেরই আর অজানা নয়। চিকিৎসায় গাফিলতি, গফিলতির জেরে মৃত্যু-সরকারি হাসপাতালেই বেশি। কিন্তু এ রাজ্যে বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোমে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে রোগী এবং রোগীর পরিবারকে ধনেপ্রাণে মরতে হচ্ছে। চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে জমিজমা, ঘটিবাটি বেচেও হচ্ছে না। প্রিয়জনের মৃত্যুর চাইতেও চিকিৎসার নামে দিন-দুপুরে ডাকাতিই আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকী, বিল মেটাতে না পারায় মৃতদেহ আটকে রাখারও নজির একাধিক। আর স্বাস্থ্য দপ্তর, পুলিশসহ সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি চোখ বুজে থেকে পরোক্ষে এসব অন্যায়ে অনিয়মে মদত জুগিয়ে চলেছে। কোথাও রয়েছে গোপন বোঝাপড়া কোথাও আবার সরকারের ওপর মহল থেকেই অভিযোগের তদন্তে সবুজ সংকেত মিলছে না। মালিকদের খুশি করতে শ্রমিকদের যেমন বলা হচ্ছে কারখানা আগে, দাবিদাওয়া পরে। ঠিক তেমনই প্রাইভেট হাসপাতাল, নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেও স্বাস্থ্য দপ্তর ব্যবস্থা নিচ্ছেনা মালিকরা রেগে যাবেন এই ভয়ে। ফলে ওইসব প্রতিষ্ঠানের কর্তারা ধরেই নিয়েছেন, এই রাজ্যে চিকিৎসার নামে যা ইচ্ছে তাই করা যায়। বিচারের আশায় পুলিশ স্বাস্থ্যদপ্তর, আদালত, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত, আর মেডিকেল কাউন্সিলের দরজায় দরজায় ঘুরছেন ভুক্তভোগীরা। বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকা কম বড় নয়। সবই কাগজ পড়ে টিভি দেখে জানতে পারছি। বন্ধু-বান্ধবের মুখেও সব শুনছি। এমনকী এখানে হাতে রেখে চিকিৎসাও চলে। সত্যিকারের সেবার মনোভাব নিয়ে সব চিকিৎসকেরা যদি চিকিৎসায় নিয়োজিত হন, তাহলে শুধু শুধু মানুষ কেন তাঁদের নিগৃহীত করবে? কিছু চিকিৎসক, নার্স কর্মীদের ব্যবহার অসহায় মানুষকে খেপিয়ে তুলতে বাধ্য করে নানাভাবে। কাগজে দেখতে পাই ও নানাভাবে জানতে পারি দক্ষিণ ভারতের হাসপাতালে ও মুম্বাই টাটা সেন্টারে মানুষ ছোটে কেন। কারণ একটাই, পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি বাঙালীরা ক্রমে আস্থা হারিয়ে ফেলছেন। কলকাতাসহ গোটা রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থায় বীতশ্রদ্ধ হয়েই শত শত মানুষ ছুটছে দক্ষিণের বিভিন্ন হাসপাতালে। সরকার যদি সব জেনে শুনে মুখ বুজে বসে থাকে, তাহলে সে সরকার থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো।

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু বলেন, কলকাতাসহ রাজ্যের সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে এখন খুবই উন্নত মানের চিকিৎসা হচ্ছে। কী চিকিৎসা হয়, তা একমাত্র যাঁরা ভুক্তভোগী তাঁরাই উপলব্ধি করেন। ঠান্ডাঘরে বসে, পুলিশ বেস্টনী নিয়ে ঘুরলে কোনওদিনই জানতে পারা যায় না। তাই কেন্দ্রের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী মহাশয়কে জানাই, বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিং হোমগুলির দিকে এই অবিচার থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচান।

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, বেহালা, কলকাতা-৬০

পরম্পরা

আমাদের ভাবধারা

সৎ ভাবনা, সৎ সঙ্গ কেন ভালো রাখে

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

কথায় আছে যেমন ভাবনা তেমনি পাওনা। তাই ভালো কথা বলতে শুরু করলে ভালবাসা অবশ্যই আসবে। এখন প্রশ্ন হল ভালো কাকে বলব? যে কথা, যে কাজ অপর একজন মানুষ বা প্রাণীকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে তাকে ভালো বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে মা সারদা বলেছেন, অপরের দোষ দেখ না। ভালো ভাবতে ভাবতে ভালো কথা বলতে বলতে চরিত্র গঠন হয়। অপর দিকে খারাপ ভাবতে ভাবতে বা খারাপ কথা বলতে বলতে বিকৃত রুচির জন্ম হয়। ভালো কথা ভাবতে বা ভালো কথা বলতে বলতে জীবন হয়ে উঠে সুস্থ ও সুন্দর। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, 'আমার জীবনই আমার বাণী'। এখন প্রশ্ন হতে পারে বাণী কাকে বলে? যে কথা শুনলে আমাদের জীবন হয়ে উঠে মধুময় তা হল বাণী, যে কথা শুনলে আমাদের জীবনের ঘটে উত্তরণ তা হল প্রবচন।

যাই হোক, ভালো কথা ভালো পরিবেশ তৈরি করে। পরিবেশ মানুষকে সঠিক পথ দেখায়। ভালো পরিবেশে মানুষ ভালোটা শেখে। ভালো মন্দ বিচার করার ক্ষমতা পায়। পক্ষান্তরে পরিবেশ খারাপ হলে ভালোমন্দ বিচারের ক্ষমতা মানুষ হারিয়ে ফেলে। চাপের মুখে সে বাধ্য হয় একদিকে ঝুঁকতে।

চারিত্রিক বৈষম্যের কথা সোজা করে বুঝিয়েছেন প্রখ্যাত বৃটিশ প্রাণরসায়নবিদ্ ডঃ লিনে বোদি। "আমাদের শরীরে যে কোটি কোটি কোষ আছে তার প্রতিটিতে থাকে জীবনের অনু। একে ডি এন এ বা ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড বলে। কোষের নিউক্লিয়াসে অতি সুরক্ষিতভাবে থাকে এই রাসায়নিক পদার্থটি। সব নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী এটিই। অনেকটা সিঁড়ির মতো দেখতে। বংশপরম্পরায় এটি সন্তানে পরিচালিত হয়। তাই পিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই সাধারণত প্রকাশ পায় পুত্রে। এটি সম্ভব হয় কি করে?

ডঃ বোদি বুঝিয়েছেন — মনে করুন পিতা অত্যন্ত বুদ্ধি মান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। পিতার বুদ্ধি মত্তা সন্তানে পরিচালিত হবে ওই ডি এন এ সঞ্চ লনের মধ্য দিয়ে। আসলে ডি এন এ থেকে আর একটি রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয়। এর নাম আর এন এ — পুরো কথাটি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড। এই পদার্থটি ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে জানা গেছে। আর এন এ নানান ধরনের হয়ে থাকে। হেটারোজেনাস নিউক্লিয়াস আর এন এ, টসিফার আর এন এ, মেসেঞ্জার আর এন এ, রাইবোজোমাল আর এন এ ইত্যাদি। এছাড়া কৃত্রিম কোষ কালচার পদ্ধ তিতে এস এস (স্মল স্টে বিল) আর এন এ এবং এস এন (স্মল নিউক্লিয়ার) আর এন-এর উপস্থিতি। কোষাকৃতি রক্ষণাবেক্ষণে তথা চারিত্রিক প্রকৃতির সঙ্গে শেষোক্ত আর এন এ দুটি বিশেষভাবে সম্পর্কিত বলে গবেষকরা মতমত দিয়েছেন। আর এন এ দিয়ে সংশ্লিষিত প্রোটিনও এই ব্যাপারটির সঙ্গে যুক্ত বলে প্রকাশ পেয়েছে। এভাবে যদি বুদ্ধি মত্তা পরিচালিত হত, তবে তো সকলেরই একই বুদ্ধি মত্তার অধিকারী হত। তাহলে নানা সময়ে কেন দেখা যায় মত পার্থক্য? প্রশ্ন আসে বুদ্ধি দীপ্ত পিতার দেহের ডি এন এ সন্তানের দেহে যদি পরিচালিত হয় তবে তা আবার খারাপ হয় কীভাবে? পিতার সুস্থ ডি এন-ই তো পুত্রের পাওয়ার কথা!

ডাঃ জোস বললেন, স্বাভাবিক ভাবে তা হওয়ার কথা, হয়তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি পুত্রে পরিচালিত হয়। তবে পিতার শরীর থেকে আসা সুস্থ ডি এন এ পুত্রের দেহে নানা কারণে অসুস্থ হয়ে উঠতে পারে। অনেক কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে। এর কোনও একটির জন্যই শরীরে এই বিপত্তি ঘটে থাকে। কয়েকটি কারণকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১। সোমাটিক মিউটেশন :

খাদ্যের মাধ্যমে কিছু বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ শরীরে ঢুকে ডি এন এ-তে পরিবর্তন আনে। অতিরিক্ত রশ্মি এবং দূষণজাত পদার্থও একাজ করতে পারে।

২। ওয়ার অ্যান্ড টিয়াব

ডি এন এ-তে যতই পরিবর্তন আসুক না কেন প্রতিটি সুস্থ শরীরে এমন এক কর্ম পদ্ধ তি চলে যাতে

অসুস্থ ডি এন এ আবার সুস্থ হয়ে ওঠে। যে শরীরে এই ব্যবস্থা থাকে না তাতে অসুস্থ ডি এন এ অসুস্থই থেকে যায়। ফলে সমস্যার উদ্রেক হয়।

৩। কোডন রেসট্রিকশন

ডি এন এ-তে থাকে কয়েকটি নাইট্রোজেন ঘাটতি ক্ষারকীয় পদার্থ যেমন অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোনিন, থায়ামিন ইত্যাদি। ডি এন এ থেকে আর এন এ তৈরি হবার সময় এই সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ যথারীতি আর এন এ-তে চলে আসে। থায়ামিন প্রতিস্থাপিত হয় আর এক নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারকীয় পদার্থ ইউরাসিল দিয়ে। তিনটি নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষারকীয় পদার্থ রাসায়নিক সংশ্লেষণ মেসেঞ্জার আর এন এ-এর উপর নির্ভর করে। এর উপর ভিত্তি করে চিন্তা-ভাবনার উন্মেষ ঘটে।

৪। ফ্রিরেডিক্যাল থিয়োরি

যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থের বাইরের কক্ষে অতিরিক্ত ইলেকট্রন থাকে তাদেরকে ফ্রি রেডিক্যাল বলে। দূষণজাত প্রক্রিয়ায় এদেরকে আমরা শরীরে পেয়ে থাকি। এদের সান্নিধ্য আর এন এ-কে সংশ্লেষণ বাধা প্রাপ্ত হয়, ফলে বুদ্ধি মত্তার প্রকাশে ফাটল ঘটে।

কারণ? অনেক কারণ আছে। তবে মূল কথা হল ডি এন এ-তে পরিবর্তন। হতে পারে পিতার অথবা পুত্রের।

এ প্রসঙ্গে নোবেল জয়ী প্রাণরসায়ণবিদ অধ্যাপক ওয়াটসনের বক্তব্য, প্রোটিন শুধু দেহ তৈরি করে না। চারিত্রিক গুণাবলী প্রকাশের ক্ষেত্রেও প্রোটিনের ভূমিকা অপরিসীম। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিছু বিশেষ আর এন এ ও।

এ প্রসঙ্গে অতি বাস্তব কথা হল কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনো নয়। অতএব বংশ পরম্পরার ব্যাপারে পিতার সাথে সাথে মায়ের অবদান আছে। কারণ পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে সন্তান ২৮০ দিন থেকে মানুষ রূপ পায়। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, একজন 'মা' একশো জন শিক্ষকের থেকে বেশি। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ান বলেছেন, "তোমরা একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব। কারণ একজন মা পারেন তাঁর সন্তানকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে। মায়ের মায়াবী মুখ, আদর, ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা, মায়ের কাছ থেকে পাওয়া আনন্দ ও শিক্ষা ভবিষ্যৎ-এ সুস্থ মানুষ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মায়ের খাদ্য গ্রহণ, সৎ চিন্তা, সৎমতি, এসকল

(এরপর ১২ পাতায়)

মশলা যেখানে ওষধি

কালোজিরে

"ম্যায় কালা হু তো কেয়া হুয়া, দিলবালা হু" গানের সাথে কালোজিরের গুণ একদম এক। নামটাই শুধু কালোজিরে — দেখতে মোটেই সাদা জিরের মতো নয়। তবে যেহেতু কালো জিরে তাই এর রঙ কালো। দেখতে ক্ষুদি ক্ষুদি সিঙ্গাড়ার মতোন। সিঙ্গারায় কিন্তু একে মশলা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কালো জিরের জিরার উপর থেকে কাল রঙটা সরে গেলেই ভেতরের বাদামী রঙ চোখে পড়ে। কালো জিরেকে ঘষলে তার থেকে একটা ঝাঁঝালো গন্ধ বার হয়। মা-ঠাকুমারা এই জন্যই ঠান্ডা লেগে সর্দি হলে কলো জিরেকে কাপড়ের ছোট পুঁটলীতে মুড়ে হাতে ক্রমাগত ঘষে নাকে টানতে বলে। যার ফলে ওই ঝাঁঝালো গন্ধের সাথে সাথ সর্দি যথেষ্ট প্রশমিত হয়। কালো জিরে ভারতীয় ও বাংলার অনেক রান্না করা খাবারে ব্যবহার হয়ে থাকে। তার আস্বাদ একরকম মনোরম গন্ধের প্রতাপে। মুসুরির ডালে ফোড়ন, সব্জীতে ফোড়ন, অনেকে মাংসেও ফোড়ন হিসাবে প্রয়োগ করেন। বিস্কুট, মাছের ঝোল, বেগুনের কালিয়া আরও কত কী! যে মশলা এতো কিছুতে ব্যবহার হয় তার জনপ্রিয়তা মোটেই কম নয়। শুকনো ও ঠান্ডা জলবায়ু বিশিষ্ট অঞ্চ লে কালোজিরের চারা ভালো হয়। পূর্ব ভারতের অনেক জায়গায় এর প্রচুর চাষ-আবাদ হয়। যে স্থানে দিনের বেলায় কড়া রোদ এবং রাতের বেলায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থাকে সেই স্থানে এর ফলন বেশ ভাল। সাধারণত এদের চারা করতে হয় দোঁয়াশ ও বেলে দোঁয়াশ যুক্ত মাটিতে। আবার নদীর চরেও এদেশে চাষ মোটামুটি ভালই হয়। বছরের শেষে অর্থাৎ অক্টোবর-নভেম্বর মাসের দিকে কালোজিরে চাষীরা ঝুরঝুরে জমিতে চাষ করে। সাধারণত গা ঘেঁষে কাছে কাছে এর চাষ করা হয়। অর্থাৎ প্রত্যেকটি চারাগাছ একদম গা ঘেষাঘেষি করে রাখা হয়। কালোজিরে গাছ খুব বড় হয় না এবং গাছে প্রায় ৭০ থেকে৮০ দিনের মধ্যেই ফুল আসে।

ফল পাকতে আরম্ভ করলে গাছটি হলদেটে হয়ে যায়। এই রকম সময় ফসল তোলার উপযুক্ত। জমি থেকে গাছগুলি তুলে ফসলগুলি নীচের দিকে গোছা করে রাখা হয়। সপ্তাহ খানেক ধরে জাঁক দিয়ে রোদে শুকিয়ে বা অনেক সময় লাঠি দিয়ে পিটিয়ে কালোজিরের দানাগুলি মূল গাছ থেকে আলাদা করা হয়। ঝাড়াই করা দানাগুলিই ওই কালোজিরের দানা যা আমরা মশলা হিসাবে বিভিন্ন রান্নায় ব্যবহার করে থাকি। এ তো গেল কালোজিরের জন্ম ও ব্যবহারিক বৃত্তান্ত। কিন্তু এর ভেতরে কি কি পদার্থ থাকে তা জানাটাও জরুরি বিষয়। ইংরাজিতে ব্ল্যাক

(এরপর ১২ পাতায়)

জ্যোতিষে হৃদরোগ নিরাময়

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্যোতিষবিদ্যাকে মানুষের আরও কাছাকাছি পৌঁছে দিতে এক অনবদ্য প্রয়াস চালাচ্ছে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। জ্যোতিষবিদ্যা যুগোপযোগী কিনা এনিয়ে বিতর্ক বেধেছে বারেবারেই। বি এইচ ইউ (বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়) প্রমাণ করতে চাইছে, জ্যোতিষবিদ্যা শুধু যুগোপযোগীই নয়, উপরন্তু ডাক্তাররা যেখানে অসহায়, সেখানেই মানুষের সবচেয়ে বড় ভরসা হয়ে উঠতে পারে জ্যোতিষবিদ্যা। সম্প্রতি বি এইচ ইউ-এর এই সংশ্লিষ্ট বিভাগ একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। যার মাধ্যমে তারা যে কোনও হৃদরোগ নিরাময় করতে পারবে জ্যোতিষবিদ্যার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে পূর্ণমাত্রায় সহযোগিতা করছে ইউ জি সি (ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন)। তাদের একটি সমীক্ষক দল পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে এবং গভীর ভাবনা-চিন্তার পর প্রকল্পটিকে পুরোপুরি সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন। বি এইচ ইউ সূত্রে জানা গেছে, পুরো প্রকল্পটিতে দেখানো হবে কিভাবে হৃদরোগ সংক্রান্ত অসুখ জ্যোতিষবিদ্যার মাধ্যমে আটকানো (Prevent) বা সারানো (cure) যায়। এই প্রকল্পের ব্যাপারে ইউ জি সি'র অনুমতি পত্র (approval letter) ইতিমধ্যেই হাতে পেয়ে গিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিষচর্চা বিভাগ।

বি এইচ ইউ-এর জ্যোতিষবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ শত্রুঘ্ন ত্রিপাঠীর মতে, জ্যোতিষবিদ্যাও এক ধরনের নিরাময়ের পদ্ধতি (Therapy)। ভারতের প্রাচীন পুস্তকগুলিতে হৃদরোগ ও তার নিরাময়ে ঔষধপত্রাদির ভূমিকায় জ্যোতিষবিদ্যার অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছে। শত্রুঘ্ন ত্রিপাঠী বলেছেন, "জ্যোতিষচর্চার মধ্যে দিয়ে মানুষের হৃদরোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নির্ধারণ করা যায়। যেমন, এই হৃদরোগ কখন হতে পারে এবং হলে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হবে ইত্যাদি। আমরা নতুন কিছুই করছি না। প্রাচীন পুস্তকে এই সমস্ত রোগগুলিকে কিভাবে নিরাময় করতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আমরা সাধারণ মানুষের জন্য সেই বিষয়গুলিই পুনরায় আনতে চাইছি, অবশ্যই তা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আনা হবে।"

ইউজিসি প্রত্যাশা করছে, তাদের অনুদানের বিনিময়ে বি এইচ ইউ কর্তৃপক্ষ জ্যোতিষচর্চাকে আরও বিজ্ঞানসম্মত করে নিয়ে মানুষের কাজে লাগাবে এবং হৃদরোগে পীড়িত হওয়ার সঙ্গে তিথি-নক্ষত্রের সম্পর্কেরও সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবে।

মনে করা হচ্ছে, প্রকল্পটি কার্যকর হলে বেনারসে জ্যোতিষ হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। যেখানে রোগীদের বহুমূল্য পাথর, রুদ্রাক্ষের মালা এবং ভেষজ ঔষধ ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হবে। বিশেষ করে, হৃদরোগ সংক্রান্ত অসুখে।

সৌরজগৎকে জানতে
বাঙালী তনয়া মধুলিকা

মিতা রায়।। মেয়েরা এখন সব ক্ষেত্রেই প্রথম সারিতে স্থান করে নিয়েছে। বিশেষত কোনও বাঙালী ললনা যখন তার নিজ কৃতিত্বে সমাজে তথা ভারতবর্ষে বিশেষ স্থান অর্জন করে, তখন আমরা বঙ্গভাষীরা অত্যন্ত গর্ব অনুভব করি। স্থলে জলে মেয়েরা অনেক ভাবে দুঃসাহসিকতার প্রমাণ দিচ্ছে। কিন্তু সৌরজগতে কোনও বাঙালী কন্যা ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বিশ্বের দরবারে সকলকে চমকে দিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত সম্ভবত এই প্রথম। বাঙালী সন্তান মধুলিকা গুহঠাকুরতা।

দক্ষিণ কলকাতার বনেদি পরিবারে জন্ম ও বেড়ে ওঠা। ছোটবেলা থেকেই কন্যাসুলভ পুতুলখেলা, রান্না-বান্না খেলা খেলতে তার ভাল লাগত না। বাস্তব জগতের আকর্ষণ ছেড়ে তার দৃষ্টি চলে যেত নভোমন্ডলে। সন্ধ্যার কালো আকাশে মিটিমিটি তারা গ্রহ-নক্ষত্র তাকে যেন হাতছানি দিত। আকাশে নতুন নতুন তারা গ্রহ উঠল কিনা দেখার জন্য সঙ্গে থাকত টেলিস্কোপ। কী যে আনন্দ পেত সে সেই জানে। বাড়ির আর সকলে অবাক হয়ে যেত। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু গ্রহ নক্ষত্র দেখা নয়, অসীম রহস্য উদ্ধারের জন্য দিনের পর দিন এক নতুন খেলায় মগ্ন হয়ে যেতে লাগল। বাবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চাকরিসূত্রে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বদলি হয়েছেন, ফলে মধুলিকাও চলত বাবার সঙ্গে এক জায়গা থেকে আরেক জয়গায়। যেখানেই যাই না কেন, আকাশ তো আছেই।

মধুলিকা

ব্যস! যতই প্রবাসী হোন না কেন, বাড়ির পরিবেশে ছিল নিপাট বাঙালীয়ানা। কৃতী ছাত্রী মধুলিকা ঘরের বাইরে পা ফেলা বা বাড়ি থেকে দূরে থাকা কখনই পছন্দ করত না। ঠিক কিছুটা এই কারণেই ঘরের মধ্যে থেকে জানলা দিয়ে আকাশ দেখা ছিল এক নেশা। আজ সে দেশের মাটি ছেড়ে নভোমণ্ডলে বিচরণকারী এক বিজ্ঞানী, এখন তাঁর ঠিকানা গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টার। নাসার একজন সফল বিজ্ঞানী হিসেবে এখন তাঁর পরিচয়। মার্কিন গবেষণা সংস্থা 'নাসা' আজ মধুলিকাকে সামনে রেখে সূর্যে পাড়ি দেওয়ার লক্ষ্যে। ঘরের জানালা দিয়ে যে রাতের আকাশ দেখত সে, আজ সরাসরি সেই নভোলোকে তার অবাধ বিচরণ।

ছাত্র-জীবনে পড়াশোনায় ভাল ছিলেন, কিন্তু বিজ্ঞানের সাধারণ পড়াশোনা করবেন ভাবতেন না। অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স তাকে টানত। তাই মুম্বাই থেকে বিজ্ঞানে গ্রাজুয়েশন করে অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স নিয়ে এম ফিলও করেন ৮০-তে।

চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা / কোথায় এমন উজল ধারা — সেই ধারার বিস্ময়ে পাড়ি দিল মার্কিন মুলুকে । এখানে পড়াশোনার পাশাপাশি গণিতবিদ বব গিলফোড়ির সঙ্গে পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা এবং সর্বোপরি সাত পাকে বাঁধা। ৯৩-তে নাসার বিজ্ঞানচর্চা কেন্দ্রে গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টার-এর হেলিওফিজিক্স দপ্তরে কর্ম শুরু। শাখা ছিল মেরিল্যান্ডে। 'করোনা' অর্থাৎ সূর্যের পরিধি বরাবর অংশ নিয়ে গবেষণাও করেন তিনি। গডার্ডে 'স্পার্টান ২০০১' শীর্ষক পাঁচটি অভিযানে তিনিই ছিলেন 'কো-ইনভেসটিগেটর'। তাঁর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানসিকতার কারণেই নাসার সদর দপ্তরে প্রতিনিধি হিসাবে মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী এক অবিস্মরণীয় কীর্তি-উজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করেন। এবছর তা ৭৫ বছর পূর্ণ করল।

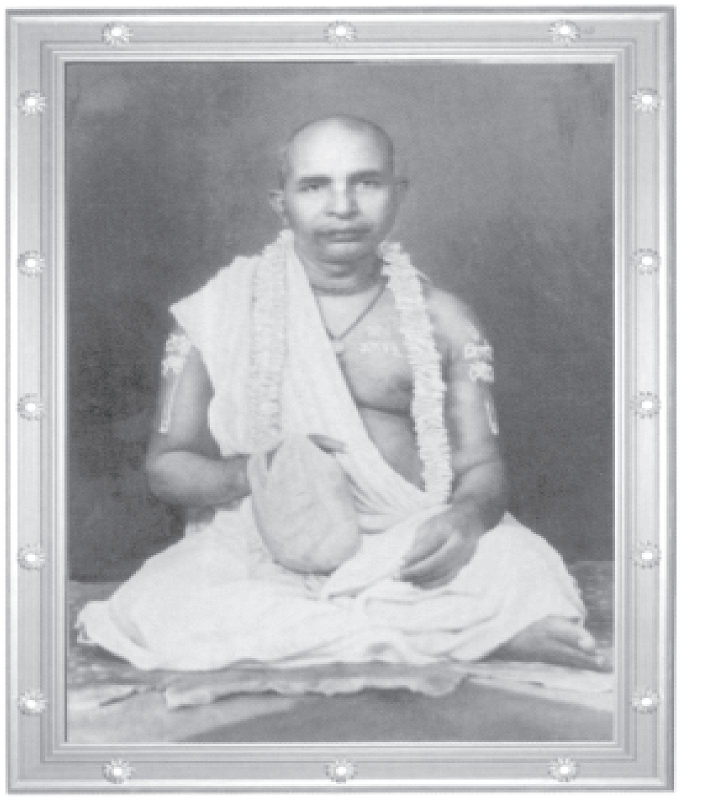

মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর ঐতিহাসিক কীর্তির ৭৫ বছর পূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আমেরিকার চিকাগোর ওয়ার্ল্ড ফেলোশিপ অফ ফেথস্ (২য় বিশ্বধর্ম সম্মেলন) —এ মহানাম সম্প্রদায়ের সভাপতি ডঃ শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের ৭৫ বছর বর্ষপূর্তি উৎসব পালন করল মহানাম সেবক সঙ্ঘ। গত ৫ ও ৬ জুলাই কলকাতার রঘুনাথপুরের শ্রী মহানাম অঙ্গন প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৯৩৩-এ চিকাগোর ওই সভায় সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী এক অবিস্মরণীয় কীর্তি-উজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করেন। এবছর তা ৭৫ বছর পূর্ণ করল। অনুষ্ঠানের শুরুতেই মঙ্গলাচরণ করেন শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ। ৫ জুলাই, অনুষ্ঠানের প্রথমদিনে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, তথা তিরুপতি সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন আচার্য

(এরপর ১৫ পাতায়)

কালোজিরে

(১১ পাতার পর)

কুসিস, বাংলায় কালোজিরে, হিন্দীতে কালোজিরে এবং বৈজ্ঞানিক নাম কুশিনাম সাইসিনাম লিস। কালোজিরে গাছের বীজের ভেতরে থাকে বিশেষ ধরনের ভলাটাইল ওয়েল, সাইরিওটিক অ্যাসিড, টেলফাইরিক অ্যাসিড, স্যাপোজেনিন এবং মেনানমিজেনিস। তাছাড়া কারমিনেটিভ, স্টিমুলাস্ট, অ্যাপেটিন্সার, ডিউরেটিক ও অ্যাথেলমিসথিক ইত্যাদি পদার্থও দেখতে পাওয়া যায়। কালোজিরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজগুলির মধ্যে এক রকম ধরনের রসায়ণ লুকিয়ে রয়েছে। কালজিরের নানা গুণে সমৃদ্ধ বলেই দিদিমা-ঠাকুমারা টোট্‌কা ঔষধ হিসাবে অনেক দিন আগেই প্রয়োগ করা শুরু করেছিলেন। সম্প্রতি তার কার্যকরী গুণের হদিশ আরও পাওয়া গেছে।

গুণাবলী ঃ (১) কালোজিরের বীজ থেকে প্রস্তুত তেল এবং সেই তেল থেকে প্রস্তুত ঔষধ মানুষকে কফের প্রকোপ ও ব্রঙ্কিয়ল অ্যাজমার মতো ব্যাধি থেকে মুক্ত ও সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

(২) অন্যান্য ফসলের বীজকে রোগ জীবাণু সহ পতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কালোজিরের ঔষধি ক্ষমতাকেও কাজে লাগানো হয়।

(৩) কালোজিরের বীজকে এক ধরনের জ্বরের ঔষধি হিসাবেও ব্যবহার করা হয় (সন্তান প্রসবঘটিত ক্ষেত্রে)।

(৪) কালোজিরের বীজ গুঁড়ো করে যে পাউডার হয় তার সঙ্গে সিসেস তেল মিশ্রণ করে চামড়ার উপরে লাগানো হয় যার থেকে মানুষের চামড়ার হিতসাধন হয়ে থাকে এবং চামড়া ফাটা দূর হয়।

(৫) জীবাণু প্রতিহত করার ও জীবাণু ধ্বংসকারী ক্ষমতা কালোজিরেয় প্রচুর।

(৬) পরীক্ষ-নিরীক্ষায় জানা গেছে কালোজিরেতে ক্যানসার জাতীয় রোগের প্রতিরোধক ক্ষমতা বর্তমান।

(৭) কালোজিরে সর্দি বা ঠান্ডা লাগলে তেলের সাথে বুকে মাথায় লাগালে লাঘব হয়, জরায়ু প্রসব পরে শুকাতে ঘি, গোলমরিচ, কালোজিরার ভাত খেলে উপকার হয়, কালোজিরে হজম করতে সাহায্য করে, ঠান্ডা লেগে মাথা যন্ত্রণা করলে নস্যির মতো নাকে টানলে খুব তাড়াতাড়ি উপকার পাওয়া যায়।

আমাদের ভাবধারা

(১১ পাতার পর)

ক্ষেত্রে অনেকখানি ভূমিকা গ্রহণ করে। সু-সংস্পর্শ, সুপরিবেশ, সুনাম, সুবাক্য, সুবচন, সুস্থ সুন্দর ভাবনা, সুমন ও সুমতির অন্যতম প্রধান উপাদান।

অতএব সেই এক কথা — ভালো হতে ভালো ভাবো, ভালো কথা বলো, ভালো কাজ করো। অপরকে রক্ষা করে নিজে সুরক্ষিত হয়ে যাবে। বাসযোগ্য হয়ে উঠবে এই পৃথিবী।

মিডিয়া শাসন ঃ এবার হাত নেট-এর গলায়

(৪ পাতার পর)

এই কলকাতায় সর্ববৃহৎ যে কাগজটি আগের দিন পর্যন্ত সম্পাদকীয় স্তম্ভে অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের জন্য ইন্দিরা গান্ধীর মুণ্ডপাত করে আসছিল, জরুরি অবস্থা জারির পর প্রথম দিনেই সে একেবারে ইউ টার্ন দিয়ে ইন্দিরা প্রশস্তিতে পুরো দু'কলম সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। মজার কথা হল, বিপরীতধর্মী এই দু'ধরনের সম্পাদকীয় একই লেখকের রচনা। নিজে মনেপ্রাণে ইন্দিরার এই স্বৈরতন্ত্রী পদক্ষেপের ঘোর বিরোধী হলেও সেদিন কর্তার ইচ্ছাতেই এই কর্ম করতে হয়েছিল অতি খ্যাতনামা এক সাহিত্যিক সাংবাদিককে।

এ রাজ্যে একটি মাত্র ইংরেজি সংবাদপত্র অবশ্য কিছুটা সাহস দেখিয়েছিল। সম্পাদকীয় স্তম্ভ খালি রেখে, রবীন্দ্রনাথের 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির' ছত্র কয়েকটির ইংরেজি তর্জমা প্রকাশ করে। রাইটার্স বিল্ডিংসের সেন্সর কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্রের বরার স্ট্যাম্প ছাড়া একটি শব্দও প্রকাশের অধিকার ছিল না কারোরই। সাংবাদিকদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রবীণ যাঁরা, তাঁরা একরকম মেনেই নিয়েছিলেন ব্যবস্থাটাকে। মালিকরা যখন মেনে নিয়েছেন, তখন আপত্তি জানিয়ে চাকরি খোয়াবার ঝুঁকি নিয়ে কী লাভ! এই কলমচির মতো সেসময় বয়সে যাঁরা তরুণ, তাঁরা কিন্তু কিছুতেই মন থেকে ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারছিলেন না। এই অসহনীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু করতে না পারার বেদনায় তাঁদের বুকের ভিতরটা জ্বলত। এখন ভাবলে ছেলেমানুষী মনে হয়, কিন্তু সেদিন আর কিছু করতে না পেরে সেন্সর কর্তাদের উত্যক্ত করার মধ্যে মানসিক শান্তি খুঁজে পেতেন তাঁরা। ছাড়পত্র মিলবে না এমন বেশ কিছু খবর জেনে বুঝেই লিখে পাঠানো, কখনও নির্দোষ সংবাদের ভিতরে তথাকথিত আপত্তিকর কয়েকটা লাইন জুড়ে দেওয়া, মাঝরাতে টেলিফোনে সেন্সর অধিকর্তাকে ঘুম থেকে তুলে 'কলকাতায় গাড়ি চাপা পড়ে একজনের মৃত্যু'র মতো একটা নির্দোষ সংবাদ পড়ে শুনিয়ে তা প্রকাশ করা যাবে কি না জিজ্ঞাসা করা — এমন আরও কত কী। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের ব্যক্তিগত রোষের কারণে কলকাতার সর্ববৃহৎ কাগজের দুই বিশিষ্ট সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত ও গৌরকিশোর ঘোষকে জরুরি অবস্থা জারির কয়েক মাস পরে 'মিসা'-য় আটক করা হয়। এর প্রতিবাদ জানানোর জন্য ওই কাগজের তরুণ সাংবাদিকরা তাঁদের ইউনিয়নের মাধ্যমে অফিসের মধ্যেই একটি সভা করতে চাইলে মালিকরা অনুমতি তো দেনইনি, এমনকী মিটিং রুমেও তালা লাগিয়ে দেন। মজার কথা হল, মালিকদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ওই ইউনিয়নেরই প্রবীণ সাংবাদিক নেতারা বলতে থাকেন, ওঁদের কী কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা তো আমরা জানি না। শোনা যাচ্ছে যে, ওঁদের কাছ থেকে আপত্তিকর সব কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছে। এই অবস্থায় প্রতিবাদ জানাতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। হায়, এমন না হলে সহকর্মী!

সংবাদ মাধ্যমের কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী ভূমিকা নিয়েছিল ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এবং তার মালিক-সম্পাদক রামনাথ গোয়েঙ্কা। দিনের পর দিন সম্পাদকীয় কলম ফাঁকা রেখে, কখনও কখনও সেখানে দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান লেখকের প্রতিবাদী রচনার অংশবিশেষ ছাপিয়ে, আরও কতভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে প্রথম দিন থেকেই তিনি ক্ষমতাসীন দল ও নেত্রীর রোষে পড়েছিলেন, কিন্তু হাজারো বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও কখনও মাথা নোয়াননি। এই প্রখর সংগ্রামী মানসিকতার জন্য ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে রামনাথ গোয়েঙ্কা তাই আজ একটি স্মরণীয় নাম। প্রতিষ্ঠাতা না হয়েও এক্সপ্রেসের জনক বলতে বোঝায় তাঁকেই। সেই ১৯৩২ সালে মাদ্রাজে পত্রিকাটির প্রকাশের চার বছর পর তাঁর তাতে যোগদান আর স্বাধীনতার আগে ও পরে একটানা ৪৪ বছর ধরে নানা ঝড়-ঝাপটা বাঁচিয়ে সেটিকে একসময় দেশের সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্রে পরিণত করার কৃতিত্ব তাঁরই। গোড়া থেকেই কংগ্রেসী রামনাথ মাদ্রাজে ও পরে জাতীয় রাজনীতিতে ছিলেন দলের অন্দরমহলের লোক। টি জে এস জর্জের 'দ্য গোয়েঙ্কা লেটার্স'-এ দেখা যায়, বেশ কিছু বড় নেতা চিঠির সূচনায় তাঁকে 'কিং মেকার' সম্বোধন করছেন। মোরারজি দেশাইকে দেশের একমাত্র 'রাষ্ট্রনায়ক' বলে মনে করলেও লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর গোয়েঙ্কা ইন্দিরা গন্ধীকেই প্রধানমন্ত্রী পদে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই ইন্দিরাকেই কংগ্রেস ভাঙার ঘুঁটি সাজাতে দেখে দল ছাড়েন তিনি। জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে এক্সপ্রেসকে গোয়েঙ্কার হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার জন্য একের পর এক চাপ দেন ইন্দিরা। প্রথমে কাগজটাকে কংগ্রেস দলের হাতে তুলে দিতে বলা হয়, তারপর সরকার মনোনীত ডিরেক্টরদের সংখ্যাধিক্যে পরিচালন ক্ষমতা হাতে নেওয়ার চেষ্টা হয়, কিন্তু রামনাথের কৌশলের কাছে সে সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। কর বাকির অভিযোগে কয়েকবারই এক্সপ্রেসের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হয়, কিন্তু আদালতের দ্বারস্থ হওয়া মাত্রই সেইসব অপকৌশল বানচাল হয়ে যায়। ফলে মাঝে মধ্যে দু-একদিন কাগজ বন্ধও হয়েছে। তখনকার কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্ল তাঁকে সপরিবারে মিসায় আটক করার হুমকি দিলে তিনি মুখের উপর বলে এসেছিলেন, 'যদি তুমি রবিচরণ শুক্লর ছেলে হও, গ্রেপ্তার করার সাহস দেখিও।' সে সাহস বিদ্যাচরণ দেখাননি। বরং ততদিনে 'সর্বোচ্চ মহলের' নির্দেশে সংশ্লিষ্ট সরকারি ফাইলে নোট পড়ে গিয়েছিল, 'গ্রেপ্তার ছাড়া সব কিছু চেষ্টা করুন।' কেননা তার আগেই 'সর্বোচ্চ মহলের' কাছে একটি মোক্ষম বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন রামনাথ — আমাকে গ্রেপ্তার করা হলে বিদেশে সযত্নে রক্ষিত কিছু ব্যক্তিগত চিঠিপত্র কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করে দেওয়া হবে। চিঠিগুলি ইন্দিরা, ফিরোজ গান্ধী ও গোয়েঙ্কার পরস্পরকে লেখা। নেহরুর প্রতি ব্যক্তিগত সৌজন্যের খাতিরে গোয়েঙ্কা একসময় ফিরোজকে চাকরি দিয়েছিলেন। সাবেক জনসঙ্ঘের সমর্থন নিয়ে মধ্যপ্রদেশের বিদিশা থেকে এম পি হয়েছিলেন গোয়েঙ্কা। পূর্ণ মদত দিয়েছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনে। কিন্তু সেই জে পি যখন পতনের সামান্য কিছু দিনের মধ্যেই মোরারজি দেশাইয়ের জনতা সরকারের কাজকর্মে প্রকাশ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন, গোয়েঙ্কা চিঠি দিয়ে তার প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন, এই তো ক'মাস তারা ক্ষমতায় এসেছে, এরই মধ্যে তাদের বিব্রত করা উচিত নয়, এতে ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেসেরই সুবিধা করে দেওয়া হবে।

মিডিয়ার উপর আঘাত হানতে সরকার ফের আটঘাঁট বেঁধে তৈরি হচ্ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মিডিয়াও ততোধিক দায়িত্ব-জ্ঞানহীন হয়ে পড়ছে। রামনাথ গোয়েঙ্কার কথা তাই আজ বড় বেশি করে মনে পড়ছে।

টেলিভিশনেই পরাস্ত

(৩ পাতার পর)

করতে পারেনি! সংবাদ সমূহ এবং বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনাগুলি ভালোভাবে দেখলে এই কথাটা মনে হতে বাধ্য যে, ওই সংবাদসমূহ এবং আলোচনাগুলির ওপর সরকারিভাবেই মূল্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এমনকী, যদিও প্রধানমন্ত্রী দু-একটি জনসভায় উপস্থিত হয়েছেন কিন্তু তিনি আঞ্চলিক চ্যানেলগুলিতে ক্রমাগত বিবৃতি দিয়ে গিয়েছেন। সেই চ্যানেলগুলি সবই কিন্তু হিন্দি ও ইংরেজিতে।

অভিযোগের একই আঙ্গুল কিন্তু তোলা যায় ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি'র) দুই শীর্ষনেতা লালকৃষ্ণ আদবানী এবং নরেন্দ্র মোদীর দিকে, তাঁদের উচ্চনাদে বাগ্মীতার জন্য। বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলগুলি তাঁদের বক্তব্যের ক্লিপিংস বারবার সম্প্রচার করেছে, বলা বাহুল্য, তাঁদের (লালকৃষ্ণ আদবানী ও নরেন্দ্র মোদী) বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর সুনাম এবং ইউ পি এ সরকারের কিছু সাফল্যকে কলঙ্কিত করার অভিযোগ উঠেছে। এই সম্প্রচারকে নিউজ বুলেটিনের অংশ হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়েছিল এবং তা দেশের যে সমস্ত জায়গায় প্রচারিত হয়েছিল সেখানে সরকারের কাজের মূল্যায়ণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। যার দরুণ সেখানকার মানুষজন মনমোহন সিংকে অন্যান্যদের থেকে একটু আলাদা বলেই ভেবেছিলেন।

আমি একটা কথা দৃঢ়ভাবে বলছি, নির্বাচনের পূর্বে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল দৈবক্রমে যেটি নির্বাচনী প্রচারে মনমোহন সিং-এর পদমর্যাদারও উপরে অবস্থান করেছিল। সেটি হল মনমোহনের হৃদযন্ত্রে শল্যচিকিৎসা (সার্জারি)। এই ঘটনাটিকে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলগুলি এবং খবরের কাগজগুলো সংবাদের শিরোনামে তুলে এনেছিল। প্রায় প্রতিদিন, যতদিন না মনমোহন সিং অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস থেকে ছাড়া পেয়েছেন ততদিন পর্যন্ত একনাগাড়ে তাঁর শরীর-স্বাস্থ্যের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে ডাক্তারদের সাংবাদিক সম্মেলনের টাটকা কভারেজ দিয়ে গিয়েছে সাংবাদমাধ্যম। এবং দর্শকদের ওপর এর যে প্রভাব পড়েছিল তাতে তারা পুরো বিষয়টিকেই (ভোট দান কাকে করবেন সেই ব্যাপারটা) নতুন করে বিবেচনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরা আসলে পুনরায় বলবৎ করতে চাইছিলেন মনমোহন সিং-এর সেই ভদ্র স্নিগ্ধ ইমেজকে, যেখানে সমস্যা সমাধানে একজন দৃঢ়চেতা মানুষের কাঠিন্য রয়েছে, যিনি দেশের হিতসাধনে সম্পূর্ণ নিবেদিত প্রাণ এক মানুষ হিসেবে গণ্য হয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে ডাক্তারদের মন্তব্যগুলি হয়তো বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে মানুষ হিসেবে মনমোহন সিংকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। যেটি কোটি কোটি মানুষের সহানুভূতি আদায় করে নিতে পেরেছিল, যাঁরা সেইসমস্ত নিউজ বুলেটিন দেখেছিল তাদের কাছ থেকে।

উপরিউক্ত ঘটনার বিপক্ষে, আদবানী ও নরেন্দ্র মোদী যখন আত্মরক্ষার্থে একের পর এক তীব্র নিন্দাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করছিলেন, আবার সেরকম কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়াই সংবাদমাধ্যম সেই ঘটনাটি দেখাচ্ছিল। এর ফল, বিজেপির পক্ষে যতটা খারাপ হওয়া সম্ভব ঠিক ততটাই হয়েছিল। দর্শকরা একটা ধারণা করেই নিয়েছিলেন, সর্বোপরি, একজন ভদ্র, কঠোর পরিশ্রম করতে পারা, নিয়মনিষ্ঠ মানুষের বিরুদ্ধে যিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং সেই অসুস্থতার অন্যায় সুযোগ নিয়ে ওঁরা (আদবানী ও মোদী) কুৎসায় মেতেছেন। কিন্তু এটা পরিস্থিতির সরলীকরণ হয়ে গেল। অবশ্যই টেলিভিশনগুলির একটা ন্যূনতম মূল্যবোধ থাকা উচিত এই ছোট-খাটো প্রভাবগুলি সম্পর্কে, অন্তত অন্যান্য মাধ্যমগুলির তুলনায়।

বিষয়টি বোঝার জন্য দেখা যেতেই পারে একদা মার্কিন টেলিভিশনে প্রদর্শিত হওয়া কেনেডি-নিক্সনের তর্ক-বিতর্কের সেই ধ্রুপদী চিত্রটির দিকে। যেটি একই সাথে সম্প্রচারিত হয়েছিল রেডিওতে, সারা ইউনাইটেড স্টেটস জুড়েই। চিত্রটি এরকম যত্ন করে একটা অর্কেস্ট্রা (লেখক এখানে অর্কেস্ট্রা বলতে মঞ্চ প্রস্তুত বোঝাচ্ছেন) সাজানো হয়েছিল স্টুডিওতে। সেখানে অতিরিক্ত গরমে গলদঘর্ম হচ্ছিলেন নিক্সন। তাঁর চড়া সাজ-পোশাক ও সবকিছু গোপন করবার চেষ্টা — এই জিনিস দু'টি তাঁর ভ্যাবাচাকা খাওয়া মুখের প্রতিচ্ছবিকে সফল ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল। তাঁকে (নিক্সন) হাল্কা পোশাক পরানো হয়েছিল যেখানে ব্যাক-গ্রাউন্ডও ছিল ওইরকম হালকা রঙের। সেখানে কিন্তু কেনেডি ভেবেচিন্তেই পরিধান করেছিলেন একটি গাঢ় রঙের পোশাক। কারণ এটা খুবই সুকৌশলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল (টেলিভিশন চ্যানেলগুলির পক্ষ থেকে) যে, কেনেডিকে এমনভাবে উপস্থাপিত করা হবে যাতে বোঝা যায় তিনি পায়ের সমস্যায় জর্জরিত এবং যার জন্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। কিন্তু এসবই নিক্সনের বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর প্রশ্নচিহ্ন তুলে দেয়। ব্যবহারিক বিদ্যায় সাজানো এবং (জনগণের থেকে) সুদূরস্থিত নিক্সনের তুলনায় কেনেডিকে অনেক সহজ, টেনশনহীন এবং আনন্দঘন দেখাচ্ছিল উক্ত অনুষ্ঠানে। সেই দেখে দর্শকরা অত্যুৎসাহে বলেছিলেন, কেনেডি অনেক ভালো কাজ করেছেন (নিক্সনের তুলনায়)। বিস্ময়কর হল, যাঁরা রেডিও শুনছেন (অর্থাৎ যাঁরা টিভিতে নিক্সন ও কেনেডিকে দেখেননি) তাঁদের মধ্যে ৮০ শতাংশই বলেছেন, নিক্সন বেশি ভালো কাজ করেছেন।

আমি ঠিক এই কথাটাতেই আসতে চাইছি, টেলিভিশনের ইমপ্রেশন (প্রভাব) এইসব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের পার্থক্য গড়ে দেয়। আজকের দিনে টেলিভিশন দেশের কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। আপন স্বার্থে ব্যবহার করা ছাড়া নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীরা কেউই কোনও মাধ্যমের (মিডিয়াম) ক্ষমতাকে আর কাজে লাগাতে পারবেন না যেটা তাঁরা বরাবরই পেরেছেন। উপযুক্ত সময়ে, ঠিকঠাক কথাবার্তাই তাদেরকে জনগণের সামনে সঠিকভাবে উপস্থাপিত করতে পারে। তাঁরা কি এর কোন ব্যত্যয় করতে পারেন? কেউ উত্তর দিতে পারবেন না। কিন্তু কোনও মাধ্যমের যত্নশীল উপস্থাপনই ভাল প্রভাব ফেলতে পারে এবং সেটা ঘটনা। তাই এতে কোনও সন্দেহই নেই, ভবিষ্যতের নির্বাচনেও তা পারবে।

(সৌজন্যে ফ্রন্টলাইন)

সৌরজগতকে জানতে

(১২ পাতার পর)

স্টিরিও অভিযানে পাঠানো হয় কৃতী বাঙালী মধুলিকাকে। সেখান থেকে তাঁর দায়িত্বশীল চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। বিষয় — 'লিভিং উইথ্ দ্য স্টার'। ২০১৫-এর মধ্যে সূর্যের বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহের জন্য যে মহাকাশযান পাঠানো হবে, তার সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত তাঁর হাতে। সূর্যের পরিধি বরাবর অংশের কথা আজও অজানা। সৌরঝড়ের প্রকৃতি ও গতিবেগও অনেক ক্ষেত্রে অচেনা। এসব রহস্য জানার জন্য মধুলিকার পাঠানো মহাকাশযান পাড়ি দেবে। সৌরমন্ডলের কাছাকাছি যে তাপমাত্রা তা সহ্য করার মতো করেই মহাকশযানটি তৈরি করা হচ্ছে এবং সৌর বিদ্যুতেই যানটি চলবে। চন্দ্রে যেমন পা দিয়ে সফল হল; তেমনিভাবে সূর্যের অচেনা অজানা জগৎ উন্মুক্ত হয়ে এক ইতিহাস সৃষ্টি হবে আর সেই ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে বাঙালী কন্যা মধুলিকা গুহঠাকুরতার নাম।

স্পেনকে সরিয়ে ব্রাজিল এক নম্বরে

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।। ব্রাজিল ছাড়া কাউকে মানায় নাকি ফিফা ক্রমতালিকায় এক নম্বরে বিরাজমান অবস্থায়? ইউরো কাপ চ্যাম্পিয়ন হবার পর প্রায় এক বছর স্পেন এক নম্বর জায়গাটি দখল করে রেখেছিল। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত আন্তঃমহাদেশীয় কনফেডারেশন কাপ জিতে ব্রাজিল ফের এক নম্বর জায়গাটি ফিরে পেল। এর আগে ফিফা র‍্যাঙ্কিং পদ্ধতি চালু হবার পর দু'বার এক নম্বরে ছিল ব্রাজিল, টানা এক থেকে দেড় বছর।

কনফেড কাপ ফাইনালে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হাফ টাইমে দু'গোলে পিছিয়ে। সেই ম্যাচ ৩-২ গোলে জিতে ব্রাজিল বুঝিয়ে দেয় দুনিয়াতে অসম্ভব বলে কিছু নেই ব্রাজিলিয়ান ফুটবল অভিধানে। ফাইনালে অবশ্য স্পেন উঠতে পারেনি। স্পেনকে সেমিফাইনালেই থামিয়ে দেয় যুক্তরাষ্ট্র। স্পেন-ব্রাজিল ফাইনাল হলে তা আরও উঁচু মাত্রার হোত বলে ফুটবল বোদ্ধাদের ধারণা। যুক্তরাষ্ট্র মূলত আলট্রা ডিফেন্সিভ ও শক্তি নির্ভর ফুটবল খেলে হাফ টাইম পর্যন্ত ব্রাজিলকে বিশেষ কিছু করতে দেয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাজিল যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধেই তাদের কাবু করে দেয়।

তবে ব্রাজিলের ফর্ম নয়, রাফ অ্যান্ড টাফ এবং শক্তি-গতি নির্ভর ফুটবল খেলে বিপক্ষকে বধ করে জয়ের কড়ি জোগাড় করা। তবে এছাড়া উপায়ও ছিল না কোচ দুঙ্গার সামনে। যুক্তরাষ্ট্রের জমাটবদ্ধ ডিফেন্স ভাঙতে ব্রাজিল দ্বিতীয়ার্ধে ৭/৮ জনকে বিপক্ষের ডিফেন্ডিং থার্ডে উঠিয়ে নিয়ে এসে ক্রমাগত প্রেসিং ফুটবলের চাপে নাস্তানাবুদ করে দেয় যুক্তরাষ্ট্রকে। আর ব্রাজিলের সুবিধে আপ ফ্রন্টে কাকা, রোবিনহো ও ফাবিয়ানোর মতো তিনজন বিশ্বমানের অসামান্য ফরোয়ার্ডকে পেয়েছে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায়। এই তিনজনের মিলিত আক্রমণে যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণচক্র ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এক সময়। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা ফাইনালে স্পেন উঠলে কিন্তু ব্রাজিলের জেতা সম্ভব হত না। যে ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্স ডোনোভান ও ডেম্পসিকে আটকাতেই জেরবার হয়ে যায় তারা কি করে টোরেস, ভিয়া, জাভি, ফাব্রিগ্রাসকে সামলাতো? স্পেন সেমিফাইনালে আটকে গেলেও এই চারজন যে খেলা খেলেছে কনফেড কাপে, এখনও তার রেশ রয়ে গেছে দুনিয়াজুড়ে সব ফুটবল প্রেমীর হৃদয়ে-মননে।

এই মুহূর্তে বিশ্ব একাদশ হলে এই চারজন হাসতে হাসতে দলে ঢুকে যাবে। স্পেনের দুর্ভাগ্য, বিশ্বের সেরা মিডফিল্ডার ইনিয়েস্তাকে পায়নি। এক নম্বর গেম কম্পোজার থাকলে স্পেন হয়ত কনফেড কাপটিই পেয়ে যায়।

এক বছর পর বিশ্বকাপ এই দক্ষিণ আফ্রিকাতেই। সেখানে আর্জেন্তিনা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, ইতালি, রাশিয়ার মত দলকে মোকাবিলা করতে হবে ব্রাজিলকে। ইতালিকে অবশ্য কনফেড কাপে দুরমার করে দিয়েছে ব্রাজিল। তবে বিশ্বকাপে ইতালি সব সময়ই মারাত্মক, অন্তত রেকর্ড সে কথা বলে। ব্রাজিলকে তাদের ডিফেন্সের ফাঁক-ফোকরগুলি মেরামত করতে হবে। বুড়ো লুসিও আর লুইজাও কদিন টানবেন? ফিলিপ মেলো যথেষ্ট প্রতিভাবান তবে ওভারল্যাপে গেলে ঠিক নেমে আসতে পারে না। আর একটু শ্লথ, দ্রুতগতির উইঙ্গার বা ফরোয়ার্ডদের বিরুদ্ধে কেঁপে যান, প্রমাণ হয়ে গেছে কনফেড কাপে।

আর কাকা, ফাবিয়ানো, রোবিনহো যত ভালই হোক, রোনাল্ডিনহোকে এখনও দরকার। রোনাল্ডোকে না নিলেও চলবে কিন্তু জন্মগত প্রতিভা রোনাল্ডিনহো ছাড়া পাওয়ার গেম খেলতে অভ্যস্ত, শক্তিশালী ডিফেন্সসম্পন্ন দলের বিরুদ্ধে জেতা সম্ভব হবে না ব্রাজিলের। ওর বল কন্ট্রোল, পাসিং, অন্যান্য ফরোয়ার্ডদের সচল রাখা সর্বোপরি সেটপিস মুভমেন্ট থেকে গোল তুলে আনা কখনো ভোলা সম্ভব নয়।

রোনাল্ডিনহোর মধ্যে এখনও যথেষ্ট ফুটবল মজুত আছে, অন্তত বিশ্বকাপ পর্যন্ত থাকবে।

খেলার জগৎ

ফেডেরারই অবিসংবাদী সেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ঠিকই বলেছেন জন ম্যাকেনরো। বিশ্ব টেনিসের একদা "ব্যাড বয়'-এর মতো চূড়ান্ত উন্নাসিক পর্যন্ত উদ্বেলিত আবেগে চরম সত্যটি স্বীকার করে নিয়েছেন দ্বিধাহীন চিত্তে। উইম্বলডন ফাইনাল দেখে সাংবাদিকদের সামনে বলেই দিয়েছেন রজার অর্থাৎ রজার ফেডেরারই বিশ্ব টেনিসের সর্বোত্তম চরিত্র, গুণগত সার্বিক উৎকর্ষতার নিরীখে, বিল টিলডেন, ডন বাজ, কেন রোজওয়াল রয়, এমার্সন, রড লেকার, রিয়র্ন বর্গ। তিনি নিজে আন্দ্রে আগাসি, পিট সম্প্রাস — যুগে যুগে যারা বিশ্ব টেনিসকে মহিমান্বিত করেছেন, আলোকিত করেছেন, রজারের বিরুদ্ধে খেললে হয়ত দশ বারের মধ্যে ৬/৭ বারই হেরে যাবেন।

কী অনন্য সাধারণ দক্ষতা ও প্রতিভা নিয়ে এসেছেন রজার ফেডেরার। মাত্র ৬/৭ বছরের মধ্যেই ১৫টি গ্রান্ডস্লাম জিতে সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে নিলেন। যেখানে রয় এমার্সন ও পিট সম্প্রাস দীর্ঘ এক দশকের বেশি সময় নিয়েছেন ১৪টি গ্রান্ডস্লাম জিততে। আন্দ্রে আগাসি ঠিকই বলেছেন — এই মুহূর্তে স্বয়ং ভগবান আর কিছুটা স্পেনের রাফায়েল নাদালই রজারের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। তবে নাদাল ক্লে কোর্টে রজারের বড় বাধা, অন্যান্য সারফেসে দুজনের মধ্যে তফাৎ খুব একটা নেই। যদিও ২০০৮-র উইম্বলডনে এই রজারকে হারিয়েই প্রথম অল-ইংল্যান্ড খেতাব জেতেন নাদাল।

তবে একটা দিক থেকে রাফা এগিয়ে আছেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রজারের থেকে। বিশ্বের সেরা সম্পদ অলিম্পিক সোনাটি কিন্তু রাফার ড্রয়িংরুমে শোভা পাচ্ছে। বেজিং অলিম্পিকে রজার কিন্তু দ্বিতীয় রাউন্ডেই হেরে গেছিলেন। তবে ওয়ারিংগারকে নিয়ে ডাবলসের সোনাটি কিন্তু তুলে নিয়েছেন রজার। এখানেই বড় খেলোয়াড়ের জীবন মাহাত্ম্য সিঙ্গলসে হয়নি কি আছে, চোখের সামনে থেকে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী সিঙ্গলস সোনাটি জিতে ড্যাং ড্যাং করে বেরিয়ে যাবেন আর তিনি সর্বকালের সেরা হয়ে শূন্য হাতে ফিরবেন, তা কি কখনও হয় নাকি?

স্মরণাতীত কালের মধ্যে এমন কোনও টেনিস কিংবদন্তীর নাম মনে আসছে না যার প্রথম ও দ্বিতীয় সার্ভ একই গতিতে ছুটে যায় বিপক্ষের কোর্টে। দুটো সার্ভিসই নিখুঁত পড়ে। সার্ভিস রিটার্ন, 'চিপ অ্যান্ড চার্জ' ভলি, ফোরহ্যান্ড ও ব্যাকহ্যান্ডে দুরন্ত সব ক্রসকোর্ট ডাউন দ্য লাইন পাসিং শট সর্বোপরি অসাধারণ শারীরিক সক্ষমতা বা রিফ্লেক্স নিয়ে এক সর্বগুণসম্পন্ন খেলোয়াড় এই সুইস তারকা। সুভদ্র, আদ্যন্ত স্পোর্টিং রজারকে আবিশ্ব টেনিস জনতা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়, মিডিয়া সংগঠক প্রত্যেকেই পছন্দ করেন। কোর্টে যেমন বৈচিত্র্যের ফুল ফোটান, কোর্টের বাইরেও বৈচিত্র্যময় জীবন রজারের। প্রেমিকাকে নিয়ে দেশভ্রমণ করেন, অবসরে গলফ খেলেন, সমাজ সেবামূলক কর্মকান্ডেও অংশগ্রহণ করেন।

সি পি এমের অবস্থা করুণ লাল ছেড়ে গেরুয়া ধরুন

শিবাজী গুপ্ত

সিপিএমের বাঁচার পথ একটিই। তাকে মুসলমান ভোটের মায়া ত্যাগ করতে হবে। মুসলমানদের এখনো তোয়াজ করে মুসলমান ভোট পাওয়ার আশা আলেয়ার পেছনে ছোটার সামিল। প্রকৃতপক্ষে লোকসভা ইলেকশনের ফলাফলেই বোঝা গেল সিপিএম এখন একটি নির্জলা হিন্দু পার্টি।

বিজেপি প্রার্থী দেওয়ায় মমতা ব্যানার্জীর দল অন্তত ৬টি লোকসভা আসন হারিয়েছে বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাঁকে সুখী করতে না পারায় বিজেপি কর্মীরাও দুঃখিত। কিন্তু তারা এই চিন্তা করে মনে মনে স্বস্তিবোধ করছে যে মোল্লাবাদী তৃণমূল কংগ্রেস অন্তত ৬টি হিন্দুত্ব বিরোধী আসন হারিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস যে কটি আসন পেয়েছে, সবই তো হিন্দু ও হিন্দুত্ব বিরোধী আসন বলে গণ্য। সুতরাং ৬টি লোকসভা কেন্দ্র থেকে হিন্দুত্ব বিরোধী কোনও সদস্য নির্বাচিত হতে পারেনি সেকথা ভেবে বিজেপি কর্মীরা আত্মপ্রসাদ বোধ করলে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। যেহেতু তাঁর কাছে বিজেপি অচ্ছুৎ।

সেদিক থেকে বিচার করলে সিপিএমেরও বিজেপির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ভাগ্যিস বিজেপি প্রার্থী দিয়েছিল। নইলে সিপিএমের ভাণ্ড তো শূন্য থেকে যেত। সিপিএমের দশা হোত লালু রামবিলাসের দলের মতো। সুতরাং বাম হাতে হলেও বিজেপিকে সিপিএমের লাল সেলাম জানান উচিত।

এই প্রসঙ্গেই একটা প্রস্তাব সিপিএমের কাছে রাখা যাচ্ছে। কম্যুনিজম তো ৩-ক অর্থাৎ কো-কে-কু অর্থাৎ কলকাতা, কেরল, কুবাতে (কিউবা) এসে ঠেকেছে। বিশ্ববিপ্লবের এখন চরম নিঃস্ব অবস্থা। কলকাতা ও কেরলে তো মুখ থুবড়ে পড়েছে; কুবাতেও মৃত্যুপূর্ব কফের ঘড়ঘড়ানি শুরু হয়েছে। আর চীনে চলছে ধনবাদী বা আমেরিকা পন্থী কম্যুনিজম — তার পরমায়ুও বেশিদিন নেই।

সুতরাং সিপিএম মার্কসবাদের মড়া আগলে আর কতো দিন বসে থাকবে? তার দেহে পচন ধরেছে, পোকা কিলবিল করছে, মাছি উড়ছে, ভনভন করছে, দুর্গন্ধে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে, শিয়াল শকুন খুবলে খাবার জন্য ছোঁ মারতে ওঁৎ পেতেছে। কাজেই যত শীঘ্র ওই গলিত পলিত কম্যুনিজমের দেহ গোবরা বা বাগমারী কবরখানায় কবর দিয়ে খাটের মড়া ঘাটের মড়া পাহারার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করুন। ভদ্রলোকের ছেলেরা শবব্যবচ্ছেদাগারে কেন আর এই পচাগলা দেহ কাটাকাটি ঘাঁটাঘাঁটি করে মরছেন। ওই নিথর অসাড় দেহে আর জীবন সঞ্চারের কোনও আশা নেই।

কম্যুনিজমের দেহ কবরস্থ করার পর নেতারা দলবদ্ধ ভাবে লাল শালু ও ধবজপতাকাগুলি বাগজোলার খালে ডুবিয়ে দিয়ে, কালীঘাটের আদিগঙ্গায় ডুব স্নান করে এবং লজ্জা না করে মাথা মুড়িয়ে গেরুয়া ফেট্টি বেঁধে কপালে সিন্দুর-চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, মাকালীর চরণে প্রণাম করে, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করুন। অঞ্জলির মন্ত্র আমরা স্থির করে দিলাম। প্রথমে দেহশুদ্ধি :—

ওঁ অপবিত্র পবিত্রা বা
লালাবস্থা গতোহপি বা
যঃ ধরেৎ গেরুয়া বস্ত্রং
সঃ বাহ্যাভ্যান্তরং শুচিঃ ।।

তারপর জোড়হস্তে ক্ষমা প্রার্থনা করুন —

ওঁ মা কালিকে, পথভ্রষ্ট সন্তানপালিকে,
মার্ক্স-মাও বিনাশিকে, বিজাতি ভাবাদর্শ
বর্জনকারীকে পদে স্থানং দেহি মে।।

এবার সর্বমঙ্গলা মায়ের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করুন :—

সেকুলারিজম বিষাক্রান্ত মম রক্তং
পরিশোধন কৃত্বা, হিন্দুত্ব বিদ্বেষ বিনাশং
কুরু,
স্বজাতি স্বধর্মপ্রীতি বর্ধনায় আশীর্বাদং
করিষ্যে।।

(বিজ্ঞ পাঠকগণ প্রয়োজনে মতো অনুস্বার-বিসর্গ যোগ করে পাঠ করবেন) এসব পরামর্শ হেসে উড়িয়ে দেবার বিষয় নয়। মরণাপন্ন সিপিএমের বেঁচে থাকার শেষ পন্থা হিসাবে আমরা এই রাজনৈতিক চ্যবনপ্রাশ প্রেসক্রিপশন দিলাম। কথায় বলে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। বাইরের আমদানি করা রক্তবর্ণ পরিত্যাগ করে সিপিএমের কর্মকর্তারা এদেশীয় পূজার্চনা কালে পূজারীরা যে রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান করেন, সাধুসজ্জনেরা যে গেরুয়া বস্ত্রাবৃত হয়ে দেশ ও দশের হিতচিন্তা করেন, ধর্মের জয়পতাকা ওড়ান সেই রং সেই বর্ণের পোষকতা করতে বাধা কোথায়? সারা পৃথিবীতে কম্যুনিজম বিলুপ্তির পথে, ইসলামপন্থীরা নিজেরা মারামারি করে মরছে। একমাত্র হিন্দুত্ববাদীরাই পরমত পরধর্ম সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রার পথ দেখাচ্ছে।

সুতরাং কম্যুনিস্টের লাল রং ও মুসলমানদের সবুজ রং যেখানে সারা বিশ্বে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে, সেখানে হিন্দুদের গেরুয়া রং-ই মানবজাতির সামনে বেঁচে থাকার একমাত্র আশার প্রদীপ। সিপিএম বিনা দ্বিধায় এই শান্তির প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত হয়ে পূর্ণোদ্যমে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে যে তাদের দিশাহারা অবস্থা তা কাটিয়ে উঠতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের এখন ঘরপোড়া গরুর দশা। জন্মলগ্ন থেকে কমিউনিস্টরা মুসলিম ভজনা করে এসেছে, হিন্দু স্বার্থের দিকে কখনো তাকায়নি। অথচ হিন্দুদের (বিশেষত পূর্ববঙ্গাগত) কাঁধে ভর দিয়েই তারা শনৈঃ শনৈঃ ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিল। ৩২ বছর পূর্বে সিপিএম দল রাইটার্সে ঢুকতেই মুসলমানরা কংগ্রেসকে ছেড়ে সিপিএম দলে গোষ্ঠীশুদ্ধ ঢুকে পড়ে। এবং বিগত ৩২ বছর ধরে সিপিএমের ছত্রছায়ায় থেকে টুঁটি চেপে ধরার ক্ষমতা অর্জন করে। সিপিএম মুসলিম দৌরাত্ম্যে চোখ বুঁজে থাকে। কারণ এমন ভেড়ার পালের মতো যূথবদ্ধ ভোট বুথমুখী তো আর কোনও সম্প্রদায় থেকে আসবে না। এদের বৈধ-অবৈধ দাবিদাওয়া মেটাতে সিপিএম যখন অপারগ হয়ে পড়ে, তখনই তারা অন্যত্র চারণক্ষেত্রের সন্ধান পেল। কারণ সেখানেই তৃণমূল বেশি পরিমাণে গজায়, ফলে পেট পুরে ভক্ষণে বেশি সুবিধা।

এদিকে সিপিএমের মাত্রাতিরিক্ত সিপিএম তোষণে হিন্দু ভোটারদের একটা বড় অংশও সিপিএমের উপর বিরক্ত হয়ে তৃণমূলের দিকে ভিড়ল। মুসলমানরা যেই দেখল সিপিএমের নৌকা ডুবছে, তারা তিলেকমাত্র দ্বিধা না করে সিপিএমের নৌকায় লাথি মেরে তৃণমূলের নৌকায় সওয়ারি হয়ে গেল। সিপিএমের অবস্থা তখন "ডুব ডুব ডুব ডুব সাগরে সিপিএম"। এবং সত্যিই সিপিএম ডুবল।

সিপিএমের বাঁচার পথ একটিই। তাকে মুসলমান ভোটের মায়া ত্যাগ করতে হবে। মুসলমানদের এখনো তোয়াজ করে মুসলমান ভোট পাওয়ার আশা আলেয়ার পেছনে ছোটার সামিল। প্রকৃতপক্ষে লোকসভা ইলেকশনের ফলাফলেই বোঝা গেল সিপিএম এখন একটি নির্জলা হিন্দু পার্টি। কারণ সে দল যা ভোট পেয়েছে তাতে গোস্তের সুরুয়া মেশেনি। হিন্দু ভোটাররাই এখন সিপিএমের পায়ের তলার মাটি হিসাবে গণ্য হতে পারে। এর উপর ভিত্তি করে এবং হিন্দু স্বার্থরক্ষায় ব্রতী হয়ে হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি রক্ষায় কোমর বেঁধে নামলে যে সমস্ত হিন্দু ভোটার সিপিএমের অতিরিক্ত মুসলিম তোষণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাদের প্রতি মুখ ফিরিয়েছে, তারা আবার সিপিএমের দিকে ফিরে আসবে।

কারণ মমতা ব্যানার্জীর অতিরিক্ত ইসলামীয়ানা ও মুসলিম ঘরানায় ইতিমধ্যেই বহু হিন্দু মনে করছে তারা ভুল ঘোড়াতেই বাজি ধরেছে। কালীঘাটে বাস করে যে মসজিদমুখী হয়ে থাকে, সে যে বাঙালী হিন্দুর পরিত্রাতা হতে পারে না, একথা বোঝার মতো বোকা নয় বাঙালী হিন্দু। কারণ, তারা ঘরপোড়া গরু;সিঁদুরে মেঘের আড়ালেই তারা আগুনের হল্কা দেখতে পায়। সুতরাং ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের মহামূল্যবান উপদেশ অনুসারে সিপিএম নেতারা লজ্জা-ঘৃণা-ভয় ত্যাগ করে বিজেপি'র হাত ধরুন এবং নিঃসঙ্কোচে গাইতে থাকুন :—

আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা
আমি যে পথ চিনি না।

ভারত বিকাশ পরিষদের কৃত্রিম অঙ্গ প্রদান

দীপক গাঙ্গুলী ।। দুঃস্থ ও প্রতিবন্ধীদের সহায়তায় ভারত বিকাশ পরিষদ এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে জনমানসে আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছে বলে দাবী করলেন পরিষদের পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি অ্যাডভোকেট নন্দলাল সিংহানীয়া।

গত ২৮ জুন হাওড়া আলমপুরে কৃত্রিম অঙ্গ প্রদানের অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ভারত বিকাশ পরিষদ, দুঃস্থদের পোশাক, ওষুধ, বই-খাতা ছাড়াও প্রতিবন্ধীদের কৃত্রিম অঙ্গ এবং তাদের চলা-ফেরার মতো ছোট গাড়িও গত কয়েক বছর ধরে প্রদান করে আসছে।

এছাড়াও রক্তদান শিবির, স্কুলভিত্তিক জাতীয়তাবাদী গীত প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান ও সঞ্চালন করে থাকে।

এবারের অনুষ্ঠানে মোট ৪৫ জনকে কৃত্রিম অঙ্গ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাঁকুড়গাছি শাখার সভাপতি টি সি মার্দা, এই অনুষ্ঠানের চেয়ার-পার্সন এস এন সুর সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

হাওড়ার তাজপুরে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের জন্মবার্ষিকী

শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিটিউট অব্ কালচার তাজপুর, হাওড়া-এর উদ্যোগে ভারত-কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম বার্ষিকী গত ৬ ও ৭ জুলাই দু'দিন ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়েছে। সরস্বতী বন্দনা ও বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী আলোচনা করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বেচ্ছা রক্তদানের রজত জয়ন্তী বর্ষে ৪০ জন মহিলা সহ ১৫০ জন দাতা রক্তদান করে এলাকায় রক্তদানের নতুন নজির সৃষ্টি করলেন। প্রখ্যাত অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জয়ন্ত চক্রবর্তী, ডঃ কিংশুক মিশ্র প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শোক সংবদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর ২৪ পরগণা বিভাগ ব্যবস্থা প্রমুখ পিনাকী পালের পিতৃদেব অনন্ত কুমার পাল গত ৪ জুলাই ৮৪ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। তিনি তিন পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

গত ১ জুলাই বুধবার সিউড়ীর প্রবীণ স্বয়ংসেবক ও বীরভূম জেলার বহু প্রাচীন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "ময়ূরাক্ষী' পত্রিকার সম্পাদক পরিমল বিষ্ণু স্বজ্ঞানে ভোর চারটার সময় সাধনোচিৎ ধামে গমন করেন।

পরিমল বিষ্ণু সিউড়ী শহরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক। সেই সময় সিউড়ীতে শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ প্রচারক ছিলেন।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

(১২ পাতার পর)

ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সিটিটিউট অফ কালচারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান শ্রীমৎ স্বামী বেদস্বরূপানন্দ মহারাজ। বিশেষ অতিথি হিসাবে এদিন উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নগর উন্নয়ণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী সৌগত রায়। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পিনাকীচন্দ্র ঘোষ। এদিন অনুষ্ঠানের মঞ্চ সঞ্চালনা করেন শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়। তিনি আকাশবাণী ও দূরদর্শনের কাজের সঙ্গে যুক্ত। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়দিন অর্থাৎ ৬ জুলাই সভাপতি রূপে ভাষণ দেন সুখচর শ্রীশ্রী কাঠিয়াবাবার আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বৃন্দাবনদাস কাঠিয়াবাবা। বিশেষ অতিথিরূপে এদিন উপস্থিত ছিলেন দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পদক মানস ঘোষ, ব্যারাকপুর গান্ধী স্মারক নিধির অধিকর্তা সুপ্রিয় মুন্সী, সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীমৎ কিঙ্কর সামানন্দ মহারাজ।

দু'দিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে চিকাগো শহরের ওই সভার মহানামব্রতজীর বক্তব্যের নাট্যরূপ। পরিচালনা করে মহানাম নাট্য সংস্থা। অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মহানাম সেবক সমিতির সভাপতি বিকাশ কুমার রুদ্র ও জ্যোতির্ময় গুহ।

Swastika
20 July - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানাল বিদ্যার্থী পরিষদ

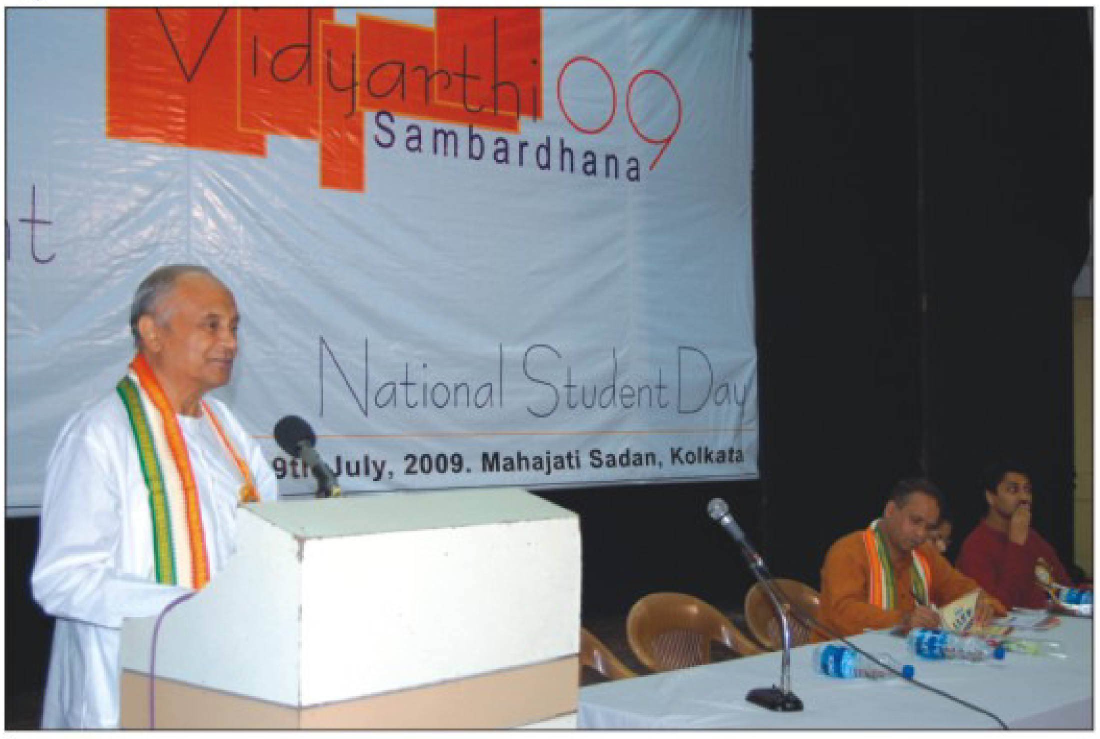

বিদ্যার্থী পরিষদের কৃতী ছাত্র সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন নৃপেন্দ্রপ্রসন্ন আচার্য, (বসে) মিলিন্দ মারাঠে ও অরিন্দম মুখোপাধ্যায়।

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। 'ছাত্রজীবনে চরিত্রগঠন, মূল্যবোধ ও উচ্চ আদর্শ না থাকলে মানুষ হওয়া যায় না। ছাত্রদেরকে এই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা এদেশের শিক্ষা পদ্ধতি বা সিলেবাসে নেই। শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এদেশের ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতি ও পরম্পরা অনুকরণ ও অনুশীলন যোগ্য। হতে হবে ম্যান অফ্ ক্যারেক্টার, ম্যান অফ্ কনভিকশন। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এ ধরনের শিক্ষা দেয়। আমি নিজে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হিসেবে গর্ববোধ করি। দেশে-বিদেশে সর্বত্র নিজের পরিচয় ব্যক্ত করি। বিদেশে গেলে যেন আমরা নিজের পরিচয় 'হিন্দু' বলে সগর্বে দিতে পারি। উপরের কথাগুলি বলেছেন প্রবাসী ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য। গত ৯ জুলাই সন্ধ্যায় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ-এর কলকাতা শাখা আয়োজিত 'কৃতী বিদ্যার্থী সম্বর্ধনা' সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি বক্তব্য রাখছিলেন। তিনি আরও বলেন, মা-বাবা এবং সর্বোপরি ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া পরীক্ষায় ভালো ফল হত না। আমাদের আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, বীর সাভারকর, ঋষি অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ এবং জগদীশচন্দ্র প্রমুখ মনীষীরা। ছাত্রদের শুধু খবরের ভাণ্ডার বা 'স্টোর হাউস অফ ইনফরমেশন' হলে চলবে না। ধী-সম্পন্ন ও বিশ্লেষক হতে হবে। আমাদের আদর্শ শ্রীরামচন্দ্র, যিনি স্বর্ণলঙ্কা জয় করার পরও সেখানে থাকেননি। বলেছেন — জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। এটাই ছাত্র সমাজকে গ্রহণ করতে হবে। সকলের জীবন মধুময়, সুখ-শান্তিতে ভরপুর হোক বলে তিনি প্রার্থনা জানান।

কানায় কানায় ভর্তি মহাজাতি সদন সভাগারে এই অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সর্বভারতীয় সভাপতি অধ্যাপক মিলিন্দ মারাঠে। তিনি তাঁর ভাষণে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য, ছাত্র সংগঠন হিসাবে বিদ্যার্থী পরিষদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের সম্পর্ক এবং ছাত্রদের স্বাভাবিক ইতিকর্তব্য বিষয়ে আলোকপাত করেন। মিলিন্দজী বলেন, ভালো ছাত্রদের সামনে ভালো কিছু কথা তুলে ধরা, তাদেরকে উৎসাহিত করা মুখ্য উদ্দেশ্য। সকলের কর্তৃত্বশক্তি আরও বর্দ্ধিত হোক আর তা দেশমাতৃকার কাজে লাগুক। দেশবাসীর উপকারে আসুক। ছাত্রদের জীবনযাপন বিষয়ে অধ্যাপক মারাঠে বলেন, আমাদের শাস্ত্র অনুসারে ছাত্রদের কাকদৃষ্টি (সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত সচেষ্ট এবং জিজ্ঞাসু থাকা), বকধ্যানম্ — বক মাছধরার জন্য যেমন একাগ্র হয়, শ্বনিদ্র (কুকুরের মতো সতর্ক নিদ্রা), আল্পাহারী-কম ভোজন করা, কেননা বেশি ভোজন হলে ঘুম আসে এবং মস্তিষ্কের বদলে পাকক্রিয়াতে রক্ত সংবহন বেশি হয়। এবং গৃহত্যাগী অর্থাৎ ঘরের বাইরের জগৎটাকে দেশকে দেখতে বুঝতে জানতে হবে। তিনি আরও বলেন, ভগবান রামচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ভারতব্যাপী ঘুরেছেন। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এলে গোখলেজী তাঁকে সারা দেশ ঘুরে দেখার কথা বলেছিলেন।

মিলিন্দজী বলেন, বিদ্যার্থী পরিষদ ছাত্রদের কারিগরি প্রশিক্ষণ, কেরিয়ার গাইডেন্স এবং আন্তঃরাজ্য জীবনযাপনের অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা (Student's Experience of inter state living Project) করে থাকে। তবে এদিন অধ্যাপক মারাঠে শিক্ষা বিশেষত উচ্চশিক্ষার ব্যবসায়ীকরণের নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। ইকনমিক টাইমস্-কে উদ্ধৃত করে অধ্যাপক মারাঠে বলেন, এদেশে ৫৩ শতাংশ মানুষের দৈনিক খরচ করার ক্ষমতা মাত্র ২০ টাকা। সরকার বলছে তেত্রিশ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গসহ অনেক রাজ্যে-ই Fees Structure Regulation কমিটি নেই। ফলে যথেচ্ছ ফি নিচ্ছে প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বৃত্তিগত আধুনিক ও উচ্চ-শিক্ষা সাধারণ মানুষের হাতের বাইরে। মহারাষ্ট্রে বিদ্যার্থী পরিষদের আন্দোলনের ফলে উপরোক্ত কমিটি গঠিত হয়েছে বলে শ্রীমারাঠে জানান। কেরিয়ার তৈরির চাপ সত্ত্বেও দেশবাসীর প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব হিসেবে কিছু না কিছু করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের আহ্বান জানান। তাঁর কথায় এজন্য প্রতিদিন কমপক্ষে ১ ঘণ্টা সময় দেশের জন্য সবাইকেই দিতে হবে।

সভা পরিচালনা করেন বিদ্যার্থী পরিষদের কলকাতা শাখার সম্পাদক দীপঙ্কর দাস। সকল কৃতী বিদ্যার্থীদের হলে ঢোকার মুখেই উত্তরীয় দিয়ে অভ্যর্থনা জানান বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মীরা। সভার শেষে প্রত্যেককে একটি পুস্তিকা ও মিস্টির প্যাকেট এবং মানপত্র দেওয়া হয়। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিকে কমপক্ষে চারটি বিষয়ে ষাট শতাংশের বেশি এবং উচ্চ-মাধ্যমিকে কমপক্ষে তিনটি বিষয়ে ষাট শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে তাদেরকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এরকম ৬০০-রও বেশি ছাত্র-ছাত্রী এদিনকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। সভার শেষে ধন্যবাদ জানান বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সহ-সভাপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়।

মহাজাতি সদনে কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ।

মানবিকতার উজ্জ্বল মুখ 'হিউম্যানিটি'

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মহানগরী কলকাতার বুকেও এবার সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কালো ছায়া। অভিযোগ উঠেছে, কলকাতার লবনহ্রদ অঞ্চলের সি এ ২২২ নং প্লটে প্রায় ৬৩ কাঠা জমি জলের দরে বিকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অভিযোগটি যার বিরুদ্ধে উঠেছে, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার আগে সাধারণত অভিযোগকারীদের বেশ কয়েকবার ভাবতে হয়। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন স্বনামধন্য ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। যাঁর মাথার ওপরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের প্রসারিত আশীষ হস্তের কথা সুবিদিত।

এহেন ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে জমি অধিগ্রহণের অভিযোগে লড়াই-এ নেমেছেন লবনহ্রদের বুদ্ধিজীবীরা। তাঁদের নেতৃত্বে রয়েছেন 'হিউম্যানিটি' নামে এক বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। গত ৯ জুন লবণহ্রদ অঞ্চলে সি এ ব্লকের সামনে এক ধর্ণামঞ্চে অবস্থান বিক্ষোভের মাধ্যমে তাঁদের প্রতিবাদ কর্মসূচীর সূচনা।

গত ২৫ জুন তাঁরা ওই একই স্থানে অনশনে বসেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন ও মৃত্যুদিন উপলক্ষে ওই সংস্থার উদ্যোগে গত ১ জুলাই 'সংকল্প' গ্রহণ করা হয়। হিউম্যানিটি'র সভাপতি অজিত বিশ্বাস জানিয়েছেন,১ জুলাই সংকল্প দিবসে তাঁরা সংকল্প নেন লবণহ্রদ অঞ্চলে যতগুলি বেআইনী নির্মাণ রয়েছে, আগামী দিনে তার বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদে নামবেন। উল্লেখ্য, হিউম্যানিটির প্রতিটি কর্মসূচীতেই অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের দুই বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী — শিক্ষাবিদ সুনন্দ সান্যাল ও চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন।

সাধারণত লবণহ্রদ অঞ্চলে জমি বিক্রির আইনী অধিকার থাকে না। সেখানে জমি মূলত সরকারেরই এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার ভিত্তিতে সরকার সেই জমিকে লিজ হিসেবে আবেদনকারীকে দেয়, একটা নির্দিষ্ট বিক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে। অভিযোগ উঠছে, সরকার বি এফ-১৫৮ প্লট লিজের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করলেও আচমকা সি এ -২২২ নং প্লটটি সৌরভ গাঙ্গুলির স্কুলের জন্য দিয়ে দেয়। এ নিয়ে স্বভাবতই আঙ্গুল উঠছে পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে। হিউম্যানিটির বক্তব্য, ওই অঞ্চলেই আরও দুটি স্কুল রয়েছে, সেক্ষেত্রে সৌরভের পরিকল্পিত শিশু থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের স্কুলটির কোনও প্রয়োজনই নেই। বরং স্কুলটি হলে এলাকার মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়বে। ওই সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ মজুমদারের বক্তব্য, সি এ ২২২ একটি কলেজ প্লট এবং লবনহ্রদের জনগণের চাহিদার্থে ওখানে একটি কলেজ একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com